মনীষী-জীবনকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

সুশীল রায়

ও রি য়ে ণ্ট বুক কো ম্পা নি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬০
রাজ সংস্করণ : দুই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিঃ
১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা-৬

স্বীকৃতি

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীমেঘনাদ সাহার ছবি আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত।

শ্রীনীলরতন ধরের চিত্র শ্রীশিবেন্দ্রপ্রসাদ দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-কলেজের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

সমুদয় ব্লক আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রচ্ছদপট শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত কর্তৃক অঙ্কিত।

ভূমিকা

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যা বলেছি, এখানেও বক্তব্য সেই একই। নিজেদের চেষ্টা ও চিন্তা দিয়ে যাঁরা বরণীয় হয়েছেন তাঁদের বিষয় জানবার কৌতূহল থাকা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ কৌতূহল আমারও আছে। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এবং আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁদের মুখ থেকেই তাঁদের জীবনের কাহিনী শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সে-সৌভাগ্য সঞ্চয় ক'রে না রেখে সকলকে তার অংশী ক'রে নেওয়াই এ-রচনাগুলির উদ্দেশ্য। তাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন, আমার মনের মত ক'রে সাজিয়ে আমি তা-ই লিখেছি। কেবল জীবনের কাহিনী পরিবেশন করতে নয়, আমি তাঁদের জীবনের এক-একটি কথাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি; কতটা সফল হয়েছি তা পাঠক-সাধারণের বিচার্য। এঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলার বাইরেও ঘুরতে হয়েছে। কারো কারো সঙ্গে একাধিকবার দেখাও করতে হয়েছে, তার পর তাঁদের বিষয় লিখেছি। লেখাগুলি প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরিশিষ্টে প্রকাশের তারিখ দিয়ে দিলাম। কোনো কথা আমার শুনতে বা বুঝতে যদি ভুল হয়ে থাকে, এ জন্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের আগে লেখাগুলি এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে প্রুফগুলি তাঁদের দেখিয়েছি। আশা করা যায়, এতে সত্যের ও তথ্যের কোনো ভুল না থাকাই সম্ভব।

এ কাজ সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। আমার একার উৎসাহে বা উদ্যোগে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা

দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমার দুই পরমসুহৃদ শ্রীকানাইলাল সরকার ও শ্রীসাগরময় ঘোষ এঁদের কাছে এজন্যে আমি ঋণী। আর, রচনাগুলি আরম্ভের গোড়া থেকে তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা ক'রে ও নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন পত্রযোগে মাঝেমাঝে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। একটি জীবনকথার তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছেন শ্রীকানাই সামন্ত; এবং অপর-একটিতে এলাহাবাদের শ্রীশিবেন্দ্রপ্রসাদ দে। এঁদের সকলকেই এজন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বালিগঞ্জ
মহালয়া '৭০

সুশীল রায়

সূচী

সুশীল রায়ের অন্যান্য বই

কাব্য

পাঞ্চালী

সুচরিতাসু

উপন্যাস

একদা

ত্রিবেণী

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু। হিন্দিতে অনূদিত

রুদ্রাক্ষ

গল্প

সুশীল রায়ের গল্পসঞ্চয়ন

ছোটদের

আকাশস্বপ্ন

জীবনী

মনীষী-জীবনকথা। প্রথম খণ্ড

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীযদুনাথ সরকার

বছর চার আগের এক দ্বিপ্রহরের কথা মনে পড়ে আজ। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে ইলেকট্রিক্‌ট্রেন-যোগে চলেছি পুনায়। মসৃণ দ্রুততায় ছুটে চলেছে পরিচ্ছন্ন ট্রেন। বাঁ পাশে পশ্চিমঘাটের পর্বত-মালা। এই পর্বতমালার একটি প্রান্তে সংকীর্ণ পথ আছে। ভারতে প্রবেশের একটি খিড়কির দরজা হিসাবে নাকি ব্যবহৃত হ'ত এই পথ, যার থেকে এর নাম হয়েছে খড়কি, ইংরেজিতে যাকে লেখা হয় কার্কি। বিদেশীর হাতেব ছোঁয়ায় এমনই বিকৃতি ঘটেছে জায়গাটির নামের। কেবল সামান্য এই জায়গাটিব নামের কেন, বিদেশীব স্পর্শে ভারতেব অনেক-কিছুরই বিকৃতি ঘটেছে, বিশেষ ক'রে সম্ভবত ভারতের ইতিহাসের। বড়-বড় টানেল পার হয়ে চলেছে ট্রেন। এতে রোমাঞ্চ হতে লাগল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেও পুলকিত হচ্ছিলাম। কিন্তু প্রকৃত পুলকবোধ করছিলাম এই কথা ভেবে যে, আমি চলেছি শিবাজীর জন্মস্থানেব দিকে। যে শিবাজীকে বিদেশী ইতিবৃত্তকার 'দস্যু বলি উপহাস' করেছেন, কিন্তু যিনি, আচার্য যদুনাথ সরকারের ন্যায় ঐতিহাসিকের ভাষায়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের the greatest constructive genius among the Hindus। মিথ্যার আবরণ দিয়ে যাকে আবৃত করে রাখা হয়েছিল, সেই আবরণ আজ উন্মোচিত হয়েছে, আজ প্রকৃত শিবাজীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এতদিনকার মিথ্যা ভিড়িয়েও আজ যে প্রকৃত মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন—

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে।

এই বিস্মৃতির তল থেকে যদুনাথ উদ্ধার করে এনেছেন শিবাজীকে। তিনি বলেছেন—

There cannot be a higher destiny for a man than to be the maker of a nation and that was exactly the achievement of Shivaji.

যদুনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এই সত্যের অনুসন্ধানে কাটিয়েছেন, তাই আজ তিনি তাঁর নিঃস্বার্থ নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন।

১৯৫২ সালের ২৬শে অক্টোবরের বিকাল। তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগামী ডিসেম্বরে যাঁর বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হবে, এখনো তার যৌবনোচিত উদ্যম ও তৎপরতা দেখে চমকে গেলাম। কেবল উদ্যম নয়, তাঁর চলা-বলা দেখে মনে হল এখনো উৎসাহ আর কাজের প্রেরণা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে। বললেন, "কি কি কথা জানার আছে?"

বললাম। তিনি চটপট করে লিখে নিলেন এক টুকরো কাগজে। এতটুকু হাত কাঁপল না, ঝরঝরে অক্ষরে লিখলেন তিনি।

বললেন, "যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা— স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার।"

১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ) রাজসাহী জেলার নাটোর সাবডিভিশনের আত্রেয়ী রেলস্টেশন থেকে দশ মাইল পুবে করচমাড়িয়া গ্রামে আচার্য যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পতিশর গ্রাম— রবীন্দ্রনাথের কাছারি। "সেখানে একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ এলে আমি গিয়ে দেখা করি। স্থানীয়

এম. ই. স্কুলকে হাই ইংলিশ স্কুল করবার জন্যে লোকে তাঁকে অনুরোধ করলে আমি তাঁর আমন্ত্রণে স্কুলটা পরিদর্শন করি।"

যদুনাথের ইতিহাস সাধনাকে ঐতিহাসিক সাধনা আখ্যা দেওয়া যায়। কেননা তিনি কোনো সহজ সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ না ক'রে সারা জীবন সত্যের সন্ধান করে গেছেন। বললেন, "এ পথে যে পথিক হবে, তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব—এই ফন্দী করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। যে-কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে, তার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁকে কিভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। একটানা দশ বছর নীরবে তিনি এই তথ্যসংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। চল্লিশ বার যেতে হয় মারাঠা দেশে, তা ছাড়া আগ্রা দিল্লী মালয় রাজপুতনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে যেতে হয়েছে বারো-তেরো বার। এই ভাবে ভ্রমণ ক'রে যে উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি রীতিমত বুঝবার জন্য ফার্সী মারাঠী ও পর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষা শিখতে হয়েছে। একটানা দশ বছর তাঁর এই নীরবতা দেখে তখন অনেকে বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু তখন চলেছে প্রকৃত একটা উদ্যোগপর্ব। এর পর সংগৃহীত উপকরণগুলি সাজানো, সংশোধন করা, আলোচনা করে মনের মধ্যে হজম করে দশ বছর পরে পুস্তক-রচনা আরম্ভ হল। বললেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে ধৈর্য, সুদূর পরিকল্পনা এবং সস্তা মেকি জিনিসের প্রতি বিমুখতা।"

তাঁর পিতার প্রতি তাঁর কেবল শ্রদ্ধা এবং ভক্তিই নয়, পিতার প্রতি তাঁর আছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পিতাকেই তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর তাঁর পিতা প্রথম বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন, রাজসাহীতে তখন কলেজ না থাকায় তিনি বহরমপুরের কলেজে ভর্তি হন ও বৃত্তি ভোগ করেন। কিন্তু এক বছর পরে যদুনাথের পিতামহ অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে চারদিকের জমিদারেরা তাদের জমিদারীর অংশ বেদখল করতে উদ্যত হওয়ায় এবং মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করায় তাঁর পিতাকে বাধ্য হয়ে জমিদারি রক্ষার জন্য ১৮৫৮-৯ সালে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অসময়ে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন বটে, কিন্তু তিনি ঘরে পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। বললেন, "ইতিহাস ছিল তার প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হল— কি করলে কোন্ জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্যসত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য, তা তিনি পুরাতন পার্টিশান আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছেন। এইরূপে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মূল মন্ত্রটি।"

কী সেই মন্ত্র?—সত্যের জন্যে নির্ভীক হওয়া, সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নির্ভয় হওয়া। বললেন, "সত্য প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক, তার জন্য ভাবব না"—

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।

আমার ইতিহাস-সাধনার মূলসূত্র এই, এবং এই আমার জীবন-সাধনা।"

পিতার কাছ থেকে তিনি ম্যাপ আঁকা ও ম্যাপের ঐতিহাসিক প্রাধান্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং লাভ করেন সংযত ভাষা ও সুন্দর হস্তাক্ষর। আর শেখেন স্ট্যাটিসটিক্স ও ইকনমিক ফ্যাক্টরের আবশ্যকতা।

জীবনের এই একটি দিকের শিক্ষার কথা ব'লে আর-একদিকের শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) দাদা ভবকুমার সরকার অল্পবয়সে ইংরেজি পড়ায় বাধা পাওয়াতে বাংলা সাহিত্যে অগাধ উৎসাহী হলেন। তাঁর কাছে সব ভালো বাংলা বই ও মাসিক (এবং আর্যদর্শন) প্রকাশ হওয়া মাত্র আসত। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এইভাবে তাঁর কাছে আসে। এঁর কাছে আমি বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের আস্বাদ পাই। তাঁর সংগৃহীত বই বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে দান করা হয়েছে।"

আর-একদিকের শিক্ষার কথাও উল্লেখ করলেন এই প্রসঙ্গে। —তাঁর ইংরেজি রচনাপ্রণালী শিক্ষা। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্র-নাথ ঘোষের কাছ থেকে। বললেন, "এঁর লেখার প্রতি আমার অসীম ভক্তি ছিল। আমি বার বার আমার লেখা কেটে কেটে যাতে তাঁর স্টাইল আয়ত্ত করতে পারি, তারই চেষ্টা করতাম। আপ্রাণ চেষ্টায় এই অনুকরণের ফলে অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করার ও ঠিক উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের শক্তি আমার যে একটু আছে তা আয়ত্ত করি।"

১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় যদুনাথ প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। কেবল প্রথমস্থান অধিকার করেন বললেই

সবটা অবশ্য বলা হয় না। ইংরেজ অধ্যাপক এইচ. আর. জেমস্ তাঁকে ইংরেজির প্রবন্ধপত্রে শতকরা পঁচানব্বই নম্বর এবং alpha plus দেন, অধ্যাপক পার্সিভ্যাল অন্য পত্রে দেন শতকরা নব্বই ও সাতাশি।

আজ তিনি সুস্থ সবল ও কর্মঠ; কিন্তু বাল্যকালে অসুখে ভুগেছেন খুব বেশি। রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ। ক্লাসে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন, যিনি প্রথম হতেন— সুদর্শন চক্রবর্তী— ১৮৮৫র এনট্রান্স পরীক্ষায় সমস্ত ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্রথম হন, যদুনাথ হন ষষ্ঠ।

বললেন, "রাজসাহীতে প্রতি বছর দুই মাস কাল আমি ম্যালেরিয়ায় কাতর থাকতাম। এফ. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন রোগশয্যা থেকে তুলে পালকী করে আমাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানো হয়। বেঞ্চে বসে থাকতে পিঠ বেঁকে আসত। কোনোক্রমে পরীক্ষা দিই।"

এই পরীক্ষায় তিনি দশম স্থান লাভ করেন। তার পর ১৮৮৯ সালের জুন মাসে চলে আসেন কলকাতায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শুরু করেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম ফুটবল দেখলেন। কেবল দেখা নয়, তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহপাঠী ও রুমমেট সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রায়বাহাদুর হন) ফুটবল খেলায় যদুনাথের শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়ামে তাঁর শরীর সবল ও শক্ত হয়ে ওঠে। বললেন, "আমার মানসিক প্রতিভা এবং দীর্ঘায়ু ও কর্মঠ দেহ সব পেয়েছি আমার পিতামাতার কাছ থেকে।"

১৮৯৭ সালে যদুনাথ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তৎকালীন নিয়মানুসারে প্রথমে আটখানা লেখা পেপারে পরীক্ষা দিতে হত, তাতে যে ছাত্র সর্বপ্রথম হত কেবল সেই ঐ বৃত্তি (সাত হাজার টাকা) পাওয়ার

অধিকারী হত; কিন্তু সে তার পর মৌলিক গবেষণা দ্বারা একটি গ্রন্থ রচনা করতে বাধ্য; তা না হলে এই বৃত্তির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কাটা যেত। এই কারণে ফার্সী হাতের লেখা বই পড়ে তিনি রচনা করেন এক গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এই বই *India of Aurangzib* নামে প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশ মাত্র দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে তাঁর নাম বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিলেতে নাম পড়ে গেল যদুনাথের।

তাঁর সাধনার সিদ্ধির সম্ভবত এইটেই সূচনা। ঔরঙজেবই হল তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৪ এই বিশ বছর ধরে তিনি ঔরঙজেবের আমলের ভারতবর্ষ সন্ধান করে চললেন। পাঁচ ভলিউমে তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এজন্যে তাঁকে অসংখ্য ফার্সী গ্রন্থ ও হস্তলিপি সংগ্রহ করতে হয় এবং আয়ত্ত করতে হয়। মারাঠী ও ফরাসী ভাষা এবং চলনসই পর্তুগীজ ও ডিঙ্গল ভাষা। ঔরঙজেবের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপকরণাদি ও তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধেও তথ্য ও উপকরণাদি পেয়ে যান, সেই উপকরণ কাজে লাগিয়ে ১৯১৯ সালে রচনা করেন *Shivaji and His Times* ।

বললেন, "সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে। যদি সেই সত্যই নির্ধারিত না হল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হই, তবে তো কল্পনার জগতেই রয়ে গেলাম। কিন্তু এই সত্য নির্ধারণ করলেই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ হল না। শুধু রাজা রাজ্যপরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ইতিহাস নয়। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ ও তার গায়ের চামড়াটি চোখের সামনে সহজেই আনা যায়; কিন্তু তার হৃদয়টি দেখাতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না।"

ঐতিহাসিক বলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। দার্শনিক হতে না পারলে প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না, সেদিক থেকে তিনি

দার্শনিকও। সাহিত্য-রসও আছে তাঁর মধ্যে, তাঁর খুল্লতাতের কাছে থেকে তিনি লাভ করেছেন এ সাহিত্যিক দীক্ষা। তাঁর রচনার মধ্যে এই কারণেই সরসতা আছে এবং বিভিন্ন কাব্য থেকে স্বচ্ছন্দ উদ্ধৃতিও দেখা যায়। সাহিত্যের উপরেও তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, বললেন, "সাহিত্যসেবীকে অশরীরী দেবীর পূজারী হতে হবে। তাকে প্রথমে মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, স্বাধীনচেতা হতে হবে। কেবল ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ করলেই হবে না, শুধু শ্রমশীল হলেই চলবে না, প্রকৃত সাহিত্যসেবককে উন্নতমস্তক হতে হবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করতে হবে, অর্থলোভকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। সাহিত্যিককেও হতে হবে নির্ভীক সত্যসন্ধানী।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে কার ব্যক্তিত্ব আপনার কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়।"

বললেন, "দুনিয়ার ইতিহাস পড়া গেছে। হঠাৎ কার নাম বলি।"

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম, "আমি বলছি ভারতের ইতিহাসের কথা।"

প্রথমেই তিনি নাম করলেন আকবরের। তার পর করলেন শিবাজীর নাম। বললেন, "আকবর হচ্ছেন the greatest political genius born এবং শিবাজী হচ্ছেন মধ্যযুগের ভারতবর্ষের হিন্দুর মধ্যে the greatest constructive genius।

এম. এ. পাশ করার পর আরম্ভ হয় তাঁর অধ্যাপনা-জীবন। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল কলকাতায় রিপন বিদ্যাসাগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পাটনায় তাঁর কর্মজীবন কুড়ি বছর কাটে। এখানে ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করেন। অনেক বছর ইংরেজিই অধ্যাপনা করেছেন; তার পর পড়াতেন অর্থনীতি ও ইতিহাস; অবশেষে কেবল ইতিহাস। এ ছাড়া কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর, কটকে চার

বছর তিন মাস তিনি অধ্যাপনা করেন এবং ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে পাটনা কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতের ঐতিহাসিক প্রদেশ ও শহরগুলির প্রতি টান তাঁর অসীম। চাকরির জীবনে প্রতি বছর পূজোর ছুটিতে তিনি এইসব শহর ও প্রদেশ দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এ পর্যন্ত এক মহারাষ্ট্রেই গিয়েছেন চল্লিশ বারের উপর। এইভাবে ঘুরে ঘুরে ভারতকে তিনি চিনেছেন, কেবল ভারতের মাটির সঙ্গে নয়, ভারতের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা ঘটেছে। সমন্বয়ের ভূমি এই ভারতভূমি, স্মরণাতীত যুগ থেকে সময়ের স্রোতে ভেসে এসে বিভিন্ন জাতি ভারতভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছে; সেইসব জাতির আদিম পার্থক্য বা বিশেষত্ব এখন আর নেই। ভারতের জলবায়ু, রোদ-বৃষ্টি, ভাত-রুটির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তা লোপ পেয়ে সকলেই এক ভারতীয় ছাপ নিয়েছে, এই কথা উল্লেখ করে বললেন, "আমাদের ভারতবর্ষ একতার ভূমি। প্রাচীনতম আর্যযুগ থেকে এই সমন্বয় ধারাবাহিকভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে; এবং তার শেষ ফল এখনকার আমরা।"

ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঐতিহাসিক সত্য আহরণ করাই তাঁর জীবনের কাজ। তাঁর এই কাজকে তিনি মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন—

১ সব মসলা সংগ্রহ - সব রকমের ভাষায়;

২ অন্যের কথার উপর নির্ভর না করে আদি ভাষায় উপাদান-সংগ্রহ;

৩ ঐতিহাসিক উপাদানকে তিনি বলেন সাক্ষী। এই সাক্ষীকে জেরা করে আসল কথা বার করা;

৪ ম্যাপ সামনে রাখা;

৫ কম কথায় বক্তব্য প্রকাশ করা;

৬ ক্রমাগত সংশোধন, নূতন তথ্য সংযোজন ;

৭ লিখনপদ্ধতি, অর্থাৎ স্টাইল।

এই সাতটি নক্ষত্রের সমবায়ে রচিত হয় যে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তারই সংকেতে অগ্রসর হয়ে তিনি পৌঁছন সত্যের ধ্রুবতারায়।

ছেলেবেলা থেকেই দুষ্প্রাপ্য বই জোগাড় করা তাঁর বাতিক ছিল। ছাত্রজীবনে জলপানির সব টাকা যেত এইসব বই কিনতে, কর্মজীবনে বেতনের অনেক টাকা যেত এই খাতে। কেবল বই নয়, ম্যাপও। বলতেন, "শিখযুদ্ধ, নেপালযুদ্ধ, সিপাইবিদ্রোহ সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সব কিনেছি। আমার নীট আয়ের অর্ধেক গিয়েছে পারসী হস্তলিপি নকল করাতে, বিলেত থেকে তার ফটো আনতে, এবং দুষ্প্রাপ্য নানা ভাষায় গ্রন্থ কিনতে।"

গ্রন্থাকারে তাঁর ইংরেজি ও বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলিই, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে তাঁর অনেক রচনা। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, অলকা, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে ১৩০২ সন থেকে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সংখ্যা এক শতের উপর। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরাজি বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থের ভূমিকার সংখ্যাও সামান্য নয়। এগুলি সংগ্রহ করে একত্র করলে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে।

১৯২৯ সালে ইনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে এঁকে ডি. লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯২৬-২৮ সালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন।

১৯২৩ সালে বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন। ঐ সমিতির চাঁদা দিয়ে মেম্বার শত শত আছে,

কিন্তু 'সম্মানিত সদস্য' কখনও ত্রিশ জনের বেশি হতে পারে না, প্রায়ই তার কম সংখ্যক থাকে। এই সম্মানিত দলে অনেক বৎসর যদুনাথ একমাত্র এশিয়াটিক। ১৯৩৪এ ইংলণ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটি তাঁকে 'করেসপণ্ডিং মেম্বর' (অর্থাৎ ঐ অনারারি মেম্বরের মত) নির্বাচিত করেন. এই গৌরবান্বিত দলের সংখ্যা চল্লিশ আবদ্ধ, যদুনাথ এখানে একমাত্র কালা আদমি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক এঁর অনেক কালের। প্রায় দশ বছর পরিষদের সভাপতি পদে ইনি বৃত ছিলেন, বর্তমানে ইনি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। বললেন, "সাহিত্য-পরিষদ প্রাণ আমার রোজই যে পাম। দেউলিয়া অবস্থা থেকে পঁচিশ বছরে পরিষৎ স্বচ্ছল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এ হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তি। আমি তাঁরই পৃষ্ঠপোষণ করি।"

আজ তাঁর মনে পড়ে অনেকের কথা কয়েকজনের মাত্র নাম করে তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিদেশীদের মধ্যে প্রিন্সিপল ডক্টর সি আর উইলসন, আই. সি. এস ও ঐতিহাসিক ডবলিউ. আরভিন, গবর্নর সার্ এডওয়ার্ড গেইট। বললেন, "দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাঁদের মধ্যে দুইজনের মাত্র নাম করব, প্রথম, গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই, বর্তমানে এঁর বয়স সাতাশি, দ্বিতীয়, শিভালিয়ার পাণ্ডুরঙ্গ স পিস্থুল্ল পনুকর (গোয়াবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ), বয়স আটাত্তর বৎসর।"

হিস্টরি অব ঔরঙ্গজেব পাঁচ ভলিউম থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০ সালের মে মাসে *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে— এসবে ১৬৩৬ থেকে ১৮০৩ সালের ইতিহাস লেখা হয়েছে। এটি একটি দুরূহ কাজ, এই কাজ শেষ করতে পেরে তিনি আজ তৃপ্ত। বললেন, "দেখি এখন যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস (History of Wars in India) শেষ করতে পারি।"

বয়স হয়েছে, কিন্তু উদ্যম ও প্রেরণা এখনো যে স্তিমিত হয়নি, তাঁর এই কথাতেই তার প্রমাণ পেলাম। কেবল কথায় কেন, তাঁর চলায় ও বলায় সমস্ত উৎসাহের ও প্রেরণার শক্তিও দেখলাম স্পষ্ট। নিজের বয়স সম্বন্ধে যেন কোনো হুঁশ নেই। আমার সঙ্গে কথা শেষ হওয়া মাত্র উঠে পড়লেন তিনি, দরজার পরদা সরিয়ে নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন ভিতরে।

মনে পড়ে গেল শিবাজীর জন্মস্থানের কথা। পুনার পথে সেই ইলেকট্রিক ট্রেনে যাবার কথাটা— মসৃণ দ্রুততায় ভারতের পশ্চিমঘাটের কিনার ঘেঁষে পরিচ্ছন্ন ট্রেনের সেই শব্দহীন গতিটা।

রচিত গ্রন্থাবলী

সিয়ার উল-মুতাখ্‌খরীন — অনুবাদক গৌরসুন্দর মৈত্র (সম্পাদিত)।
কার্তিক ১৩২২। খ্রী ১৯১৫

শিবাজী। নবেম্বর ১৯২৯

মারাঠা জাতীয় বিকাশ। আষাঢ় ১৩৪৩। খ্রী ১৯৩৬

India of Aurangzib—Topography, Statistics
and Roads। খ্রী ১৯০১

Economics of British India। খ্রী ১৯০৯

History of Aurangzib Vol. I—V। খ্রী ১৯১২-২৪

Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays। খ্রী ১৯১২

Chaitanya His Pilgrimages and Teachings। খ্রী ১৯১৩

Shivaji and His Times। খ্রী ১৯১৯

Studies in Mughal India। খ্রী ১৯১৯

Mughal Administration। খ্রী ১৯২০-২৫

Later Mughals, 1707-1739। খ্রী ১৯২২

India Through the Ages। খ্রী ১৯২৮

Short History of Aurangzib। খ্রী ১৯৩০

Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire। খ্রী ১৯৩২

Fall of the Mughal Empire Vol. I—IV। খ্রী ১৯৩২-৫০

Studies in Aurangzib's Reign। খ্রী ১৯৩৩

House of Shivaji। খ্রী ১৯৪০

Maasir-i-Alamgiri। খ্রী ১৯৪৭

Poona Residency Correspondence. (Edited) Vol. I, VIII, XIV। খ্রী ১০৩৬-৫১

Ain-i-Akbari, Vol. III। খ্রী ১৯৪৮

Delhi News for Poona, 1756-1788। খ্রী ১৯৫২

Bengal Nawabs। খ্রী ১৯৫২

Ain-i-Akbari, Vol. II। খ্রী ১৯৫৩

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

এককথায় বলতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া হচ্ছে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নৈমিষারণ্য। সারা ভারতের মধ্যে এত ব্রাহ্মণের সমাবেশ আর কোথাও নেই। কেবল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মলাভ করার অধিকারেই ব্রাহ্মণ নন, তপস্যা শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণ-বংশে উদ্ভব— এই ত্রিগুণ যাঁর আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কোটালিপাড়া এইরূপ ব্রাহ্মণেরই সাধনার তপোবন-বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া— এর মধ্যে কোটালিপাড়াই সমধিক বিখ্যাত। — রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন, দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িক; নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ, সীতানাথ বিদ্যারত্ন, সীতানাথ বিদ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি স্মার্ত, কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, রেবতীমোহন কাব্যরত্ন প্রভৃতি আলংকারিক; গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, হলধর গৌতম প্রভৃতি জ্যোতিষী এক সময় কোটালিপাড়ায় বিদ্যমান ছিলেন।

এই কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ।—১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৭ই কার্তিক, খ্রীস্টীয় ১৮৭৬ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে।

হরিদাস একাকীই একটি ইন্সটিটিউশন। যে কাজ করার জন্যে ইতিপূর্বে বহু অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিত নিয়োগ ক'রে বহু বৎসর ধ'রে চেষ্টা করা হয়েছে, হরিদাস কারও আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সহায়তা লাভ না ক'রে আপন নিষ্ঠা ধৈর্য ও শ্রমের দ্বারা তা সম্পূর্ণসাধন

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
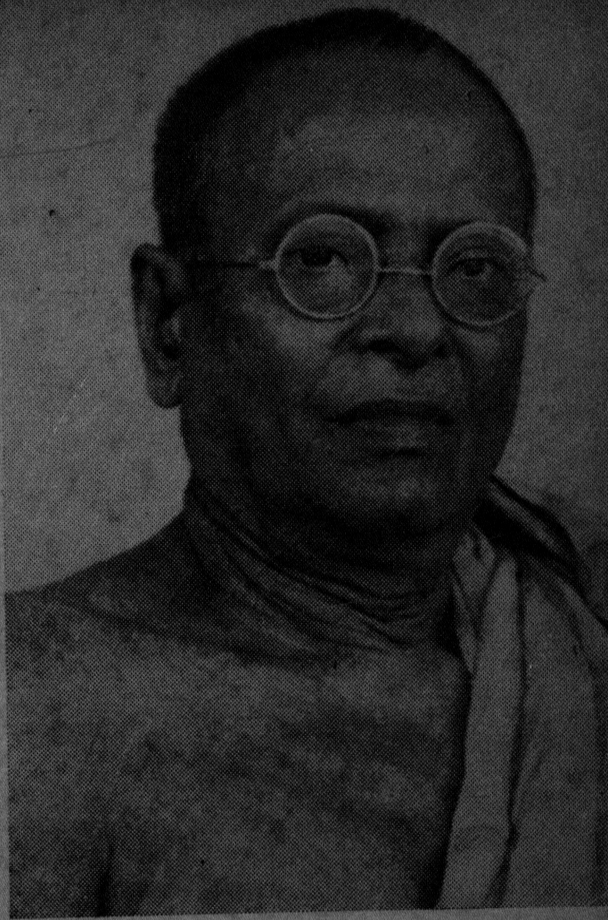
করেছেন। তিনি একক মহাভারতের মূল, নূতন টীকা, নূতন বঙ্গানুবাদ, পাঠান্তর-সংগ্রহ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা সংশোধন ইত্যাদি সমাধান ক'রে একুশ বছরে মহাভারত-রচনা শেষ করেছেন।

ইতিপূর্বে বর্ধমান-মহারাজার আনুকূল্যে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তেরো জন পণ্ডিত নিয়োগ করে মহাভারতের কেবল মূল ও অনুবাদ করতে ছাব্বিশ বছর (বঙ্গাব্দ ১২৬৫ থেকে ১২৯১) সময় লাগে, কালীপ্রসন্ন সিংহ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছয় জন পণ্ডিতের সহায়তায় সতেরো বৎসরে এর কেবল বঙ্গানুবাদ করান; পুনার ভাণ্ডারকর-সমিতি মহাভারতের কাজ আরম্ভ করেছেন খ্রীষ্টীয় ১৯১২ সালে, দশ লক্ষ টাকার উপর সাহায্য পেয়েছে এই সমিতি, এই সমিতি-প্রকাশিত মহাভারতে আছে কেবল মূল ও পাঠান্তর, সতেরো জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এই কাজ চলেছে—এ পর্যন্ত তাঁরা কেবল আদি, সভা ও বিরাট পর্ব প্রকাশ করেছেন, এখন শান্তিপর্বের কাজ চলেছে।—এর সঙ্গে হরিদাসের কাজের তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। যে কাজ দশের অসাধ্য, সে কাজ একের সাধ্য হল কী করে? তাঁর রক্তের ধারায় অবশ্যই নিষ্ঠার অকৃত্রিম স্রোত আছে।

নব্যভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিপাড়ার মধ্যে! উনশিয়া গ্রামে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র যজুর্বেদীয় অগ্নিহোত্রী পুরন্দর আচার্য বাস করতেন। তাঁর চার পুত্র—শ্রীনাথ, যাদবানন্দ, মধুসূদন ও বাগীশচন্দ্র। এই মধুসূদনই পরবর্তীকালে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মধ্যম যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য থেকে পঞ্চম রামদাস বিদ্যালংকার—এই রামদাস বিদ্যালংকার থেকেই সপ্তম হচ্ছেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর পিতার নাম গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, মাতা বিধুমুখী দেবী।

হরিদাস তাঁর জীবনে যে নিষ্ঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন তা অবশ্যই উত্তরাধিকারসূত্রে। তাই মহাভারতের ন্যায় এক বিরাট গ্রন্থের যে অরণ্য, তারই তপোবনে বসে তিনি একনিষ্ঠ মনে আরম্ভ করতে পেরেছেন তপস্যা, এবং সে তপস্যায় লাভ করতে পেয়েছেন এই সিদ্ধি। তাঁর এই কাজে তিনি চমৎকৃত ও বিস্মিত করেছেন সকলকে।

এখন তিনি বাস করেন কলকাতার এণ্টালি অঞ্চলের দেব লেনে। এর আগে ছিলেন সুরী লেনে। তার মহাভারত-রচনা দেখার জন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সুরী লেনের বাসায় এসেছিলেন, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রায় প্রত্যহ হরিদাসের রচনা দেখতে যেতেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেক মাসে এসে দেখে যেতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আরও অগণিত পণ্ডিত এই মহাভারত দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করেছেন যে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাভারত রচনার ন্যায় এরূপ বিরাট কাজ মাত্র একজনের চেষ্টায় এ পর্যন্ত পৃথিবীতে হয় নি।

কেবল মহাভারত-রচনাই নয়, এ ছাড়াও হরিদাস আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় এইরূপ বলেছিলেন যে ভগবান শংকরাচার্যের পরে শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায় বহুগ্রন্থকার ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৫৩, ৫ই বৈশাখ ১৩৬০, শনিবার। বেলা দুপুর। তাঁর দেব লেনের গৃহে বসে তাঁর জীবনকথা শুনছি। ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় ষাট বা তারও কিছু কম। এখনো বলিষ্ঠ চেহারা এবং দরাজ গলা। সারাটা জীবন কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে তিনি তাঁর দেহ ও মন সমান মজবুত রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বললেন, "পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট বিদ্যারম্ভ করি। এগারো বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্রের নিকট কলাপব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করি। পিতামহের অনুপস্থিতির সময় স্বগ্রামস্থিত গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতির (গোবিন্দ মহাশয়) টোলে সন্ধিবৃত্তি পড়ি। সন্ধিবৃত্তি পড়ার পরে কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণের নিকট চতুষ্টয় বৃত্তি থেকে কৃৎবৃত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম। তারপর কারক, সমাস, তদ্ধিত, কৃৎবৃত্তির অবশিষ্ট অংশ ও পরিশিষ্টও পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করি।"

পিতামহ ও পিতা তাঁর জীবনে অধ্যয়নের ও সাধনের যে বীজমন্ত্র উপ্ত করেছিলেন, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে এবং সেই অঙ্কুর থেকে এই মহীরুহ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে আজ সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়েছে। এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হচ্ছে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং তার মূল কাণ্ডটি হচ্ছে মহাভারত।

পনেরো বৎসর কয়েক মাস বয়সের সময় হরিদাস স্বগ্রামস্থিত আর্য-শিক্ষা সমিতিতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে শব্দাচার্য উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন। এ সময়েই সংস্কৃত ভাষায় তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয়েছিল এবং অনর্গলভাবে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্য বলতে পারতেন। সংস্কৃতে তিনি এই সময় কংস-বধ নামে এক নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি সে সময়ে কোটালিপাড়ায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। এই কংস-বধকে নাটকাস্বরূপ চম্পূকাব্য বলা চলে, কারণ এতে নাটকীয় লক্ষণ তেমন দেখা যায় না— অভিনয়ের সভায় এই প্রকার আলোচনা হয়, সভায় অনেক আলংকারিক এইরূপ আলোচনা করেছিলেন। এইসব শুনে হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত

হনে এবং পশ্চিমপাড়াস্থিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং জানকীবিক্রম নামে একখানি সর্বলক্ষণ-লক্ষিত সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এই নাটকও কোটালিপাড়ায় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়। এর পর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালেই ক্রমে তিনি শংকর-সম্ভব ও বিয়োগ-বৈভব নামে দুইখানি খণ্ডকাব্য এবং বৈদিকবাদ-মীমাংসা নামে একখানি সংস্কৃত ইতিহাস রচনা করেন।

হরিদাসের বয়স তখন বাইশ। এই সময় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি পরলোকগমন করেন। সংসারে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। এই সময় পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার হরিদাসকে কলকাতার ২নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট কাব্য পড়ার জন্য প্রেরণ করেন। পিতামহ কাশীচন্দ্র ইংরেজি বা কাব্য পাঠের বিরোধী ছিলেন ব'লে তাঁর জীবদ্দশায় হরিদাসের কাব্য-পাঠের সুবিধে হয়নি। ক্রমে কাব্যের উপাধি পাশ করে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে হরিদাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কবিরাজপুরে যান, সেখানে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছে স্মৃতি পড়তে আরম্ভ করেন। আনন্দচন্দ্রের টোল যখন বন্ধ থাকত তখন বাড়িতে এসে পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকারের কাছে জ্যোতিষ ও পুরাণ পাঠ করতেন এবং নিজে নিজে সাংখ্য বেদান্ত মীমাংসা ও পাতঞ্জলদর্শন অভ্যাস করতেন। এইভাবে ঢাকা সারস্বত সমাজে সাংখ্য পুরাণ ও কাব্যের উপাধি-পরীক্ষা দিয়ে, সব কয়টি উপাধি-পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি সাংখ্যরত্ন, পুরাণশাস্ত্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি লাভ করেন। তদবধি তিনি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রূপেই খ্যাত হয়ে উঠেছেন।

তিনি স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান এবং তার পর কলাপ-ব্যাকরণের গবর্নমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ• হন। ১৩১১ সনে স্মৃতির উপাধি-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর বাগ্মিতার বিকাশ ঘটে। যখন তিনি স্মৃতিপাঠরত সেই সময় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ মজুমদারের মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের তন্ত্রশাস্ত্রখণ্ডন বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে তিনি বিশেষ যশস্বী হন। এর পর ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার রমণীমোহন রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত প্রসিদ্ধ কবি মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি এবং বিক্রমপুরের জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে সমস্যাপূরণ বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে জয়লাভ করেন। এই সমস্যাপূরণ বিষয়ে প্রশ্নকর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী এবং মধ্যস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার প্রভৃতি। এই জয়লাভে হরিদাসের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ঢাকা বাল্যাশ্রম নামক বিরাট সভায় সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বক্তা কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিরুদ্ধে সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘকাল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে সুনাম অর্জন করেন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে কবিরাজপুরের পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের পত্নী কাত্যায়ণী দেবী ধর্মবট-ব্রত-প্রতিষ্ঠা, তুলাপুরুষদান, মহাভারত-উদ্‌যাপন এবং চতুরগ্নিযোগ করেন, এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এখানে হরিদাস উক্ত মহাভারতের পাঠক ছিলেন এবং ঐ তারিখে সেই পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে ঐ সভায় সংস্কৃত ভাষায় সুললিত বক্তৃতা দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেই দিন:রাত্রিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় রচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা অভিনীত হয়।

বললেন, "এর পর কোটালিপাড়ার নিজ বাটিতে আসি এবং কিভাবে জীবন আরম্ভ করা যায়, তা চিন্তা করতে থাকি। এমন সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত এবং আর্যশিক্ষা-সমিতি ও আর্যবিদ্যালয়ের সম্পাদক বেবণীমোহন বাবা একটি সাধা সভা আহ্বান ক'রে কোটালিপাড়ার লুপ্তপ্রায় আর্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন।"

এই অনুরোধ রক্ষা ক'রে হরিদাস ১৩১২ সনের ১৩ই আষাঢ় আর্য-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সে সময় ঐ বিদ্যালয়ে একষট্টি জন নানাদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করত। সকালে দর্শন ও স্মৃতি, বিকালে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানো হত। সে সময় প্রথম বছরে বারো জন ছাত্র আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উপাধি পরীক্ষায় চার জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। একে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় গবর্নমেণ্ট থেকে এক বৎসর ভোগ্য মাসিক ১২ টাকা বৃত্তি এবং এককালীন ২০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছর আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় দশ জন ছাত্র পাশ করে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ৮ টাকা হারে বৃত্তি পান। এই সময় শিল্পকার্যেও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজ বাটির দুর্গা মণ্ডপ নিজে তৈরি ক'রে নিজ হাতেই টালী তৈরি করে সেই মণ্ডপ ছেয়েছিলেন। বললেন, "এ সময় আমার কয়েকটা শখ ছিল। পাখোয়াজ, ঢোল, তবলা ও হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম। সে অভ্যাস এখন অবশ্য আর নেই।"

অতঃপর তাঁর জীবন গড়িয়ে গেল অন্য খাতে। ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হল। আর্যবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রে বিরাট সংসার পরিচালনা দায় হয়ে উঠেছিল তখন। বললেন, "১৩১৩ সনের শেষের দিকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আর্যবিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে অর্থ উপার্জনের জন্যে কলকাতায় আসি। তখন নিজের ঘরে পাঁচ জন ছাত্র রেখে তাদের অধ্যাপনা করছি ও সংসারেও

নয় জন পরিজন। এই কারণে উপার্জনের কথা ভাবতে হল। কলকাতায় এলাম। কালীঘাটে শ্বশুরালয়ে থেকে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা-বিচার আরম্ভ করলাম।"

এই সময় তিনি পেয়ে গেলেন দু জন সুহৃদ ও সহায়। তাঁরা হচ্ছেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের শিক্ষক অতুল ঘোষ ও খগেন বসু নামক একজন ব্যবসায়ী। এঁরা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে প্রীত হয়ে হরিদাসের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কালীঘাট বা ভবানীপুরে টোল করে তাতে হরিদাসকে রাখার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। উক্ত অতুল ঘোষ ও খগেন বসু তখন নকীপুরের জমিদার রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুরের কাছে যান ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। হরিচরণবাবু সিদ্ধান্তবাগীশকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেখা করলে তাঁর সমস্ত পরিচয় পেয়ে হরিচরণবাবু তাঁকে নিজ বাড়িতে গিয়ে নিজের পৌরোহিত্য ও দ্বারপণ্ডিতের পদে প্রবৃত্ত হওয়াব জন্য অনুরোধ করেন এবং চল্লিশ বিঘা জমির উপস্বত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তখন হরিদাস মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচর-রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিতের পদ ও দুবলহাটির রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিতের পদ ও পূর্বপ্রস্তাবিত টোলের অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র পান। ১৩১৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ নকীপুর গিয়ে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে ঐ টোলের নাম হয় হরিচরণ চতুষ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। এই সময় সব দিক দিয়েই হরিদাসের সুবিধে হল।

বললেন, "এ স্থানের স্বাস্থ্য ভালো। লাভও প্রচুর। এবং পূর্বপ্রস্তাবিত চল্লিশ বিঘা জমি স্বল্প খাজনায় কায়েমী করার প্রস্তাব করায় হরিচরণবাবু তা'তেই সম্মত হয়ে মাত্র ২০৲ টাকা খাজনায় সেই জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এইসব কারণে সর্বপ্রকারে মনের প্রফুল্লতা উপস্থিত হওয়ায় আমি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হলাম।"

প্রথমে তিনি পূর্ব-রচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা মুদ্রণ করে প্রকাশ করলেন, তার পর ব্যবস্থাগ্রন্থ স্মৃতিচিন্তামণি রচনা করে প্রকাশ করলেন। ক্রমে রুক্মিণী-হরণ নামে কাব্য এবং বঙ্গীয় প্রতাপ নামে নাটক রচনা করেন। তার পর উত্তররামচরিত প্রভৃতি যোলোখানি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা ক'রে প্রকাশ করেন। এই সব গ্রন্থই কলকাতার বিভিন্ন প্রেস থেকে ছাপা হত। ভারতবর্ষের সর্বত্র এইসব গ্রন্থ অবাধে চলতে লাগল।

তাঁর টোল থেকে নানা শাস্ত্রের বহুছাত্র আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রত্যেক বছরই পাশ করতে থাকে। ইতিমধ্যে কাশী ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডল হরিদাসকে মহোপদেশক উপাধি ও একটি প্রশংসাপত্র দেন। ক্রমে মালতী-মাধব-প্রকরণের টীকা দেখে জনৈক পণ্ডিত তা ছাপালেন।

নকীপুর থেকে কলকাতায় বই-ছাপানো নানা রকম অসুবিধে, খরচও বেশি, ইত্যাদি কারণে হরিদাস টোলবাড়িরই একপ্রান্তে ১৩২৬ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার কাঠের জিনিসগুলি হরিদাস নিজেই দেখিয়ে দিয়ে একটা সাধারণ মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। এতে খরচ পড়েছিল চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ছাপাখানা যখন যথানিয়মে চলছে, সে সময় একদিন স্বাধীন ত্রিপুরা মহারাজার প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন মহাপীঠ ঈশ্বরীপুর যাওয়ার পথে ঐ প্রেসে ছাপা হচ্ছে দেখে পালকি থেকে নেমে প্রেসটি দেখেন, মুদ্রিত গ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং হরিদাসের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর শিল্পকার্যের নৈপুণ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করেন।

এদিকে ১৩২১ সনে রায়বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকেই নকীপুরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে ওঠে। তবু তিনি মনের জোরে সেখানে আরো অনেক দিন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকা নিরাপদ মনে

করলেন না। সুতরাং ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে কলকাতায় সুরী লেনে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সুরী লেনেই একটি ভাড়াবাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন। এই সময় নানা স্থান থেকে চার-পাঁচটি ছাত্র আসত, তিনি তাঁদের পড়াতেন।

এইখানেই তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর বিরাট ব্রত। সুরী লেনের ভাড়া-বাড়িতে বসে তিনি রত হলেন মহাভারতের কাজে।

বললেন, "নিজের ইচ্ছা ও উদ্যম ছিল ; কিন্তু তার উপর পেয়ে গেলাম দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের উৎসাহ। এরই ফলে মহাভারতের একটি বিরাট সংস্করণ প্রকাশে রত হলাম। অনেক আদর্শ-গ্রন্থ দেখে ঋষিপরিগণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার মিল রেখে, ঋষি-উল্লিখিত বৃত্তান্তের পৌর্বাপর্য ঠিক রেখে, মূলের সমীচীন পাঠ উপরে সন্নিবেশিত ক'রে, তার নিম্নে ক্রমশঃ প্রত্যেক শ্লোকের নিজকৃত ভারতকৌমুদী টীকা ও বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠ কৃত টীকা ও পাঠান্তর সন্নিবেশিত ক'রে এই মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ ক'রেছি।"

এই গ্রন্থ রয়াল আট-পেজি ফর্মার ষোলো ফর্মায় এক-এক খণ্ড হয়েছে, এ যাবৎ এইরূপ ১৩০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে শান্তিপর্বের পঞ্চবিংশ খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে, আরও সম্ভবতঃ ২৮ খণ্ড বের হবে। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে তিনি মহাভারতের কাজে হাত দেন, ১৩৫৭ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ লেখা শেষ হয়। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ছাপাও শেষ হয়ে যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন কাগজ দুর্মূল্য হয় এবং তার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে দু'বছর ছাপা বন্ধ থাকে। কেবল গ্রাহকদের উপর নির্ভর করেই তিনি ১০১ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক গ্রাহক মারা যান, অনেকে স্থানান্তরিত হন এবং কেউ কেউ ইচ্ছে করে ছেড়ে দেন। তা'তে আয় ক'মে যায় ; কিন্তু মুদ্রণ-ব্যয় এর মধ্যে বেড়ে যায় অনেক।

ফজলুল হক অখণ্ড বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে চার হাজার টাকা সাহায্য দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশ হাজার টাকা সাহায্য দেন—এতে ১৩০ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

বললেন, "আরও ২৮ খণ্ড প্রকাশ বাকি। এর জন্যে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা আবশ্যক। যদি বঙ্গীয় সরকার এ বিষয় বিবেচনা করেন, তাহলে এ গ্রন্থ ছাপা শেষ হতে পারে। আমিও শান্তি পাই।"

১৩৩৯ সাল থেকে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি-ভারতাচার্য শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত রুক্মিণী-হরণ মহাকাব্য কাব্যের মধ্যপরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে।

১৩৫৩ সালে হরিদাস-প্রণীত বঙ্গীয় প্রতাপ নাটক মিনার্ভা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তার পর তিনি মিবার প্রতাপ নাটক রচনা করেন, এ নাটকও স্টার রঙ্গমঞ্চে ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনীত হয়।

তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে পাশ করেছেন এরূপ ছাত্রের সংখ্যা, হরিদাস বললেন, "৭৫৩। এর মধ্যে অনেকে বড় বড় টোলের অধ্যাপক।"

হরিদাস এগারোটি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। আর্যশিক্ষা সমিতি থেকে শব্দাচার্য, ঢাকার সারস্বত সমাজ থেকে সাংখ্যরত্ন পুরাণশাস্ত্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ, গবর্নমেণ্ট থেকে ব্যাকরণতীর্থ কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থ—এই সাতটি পরীক্ষালব্ধ উপাধি। তদ্ভিন্ন কাশী ভারতধর্ম-মহামণ্ডল থেকে মহোপদেশক, বৃটিশ সরকার থেকে মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত-মহামণ্ডল থেকে মহাকবি এবং পুরাণ-পরিষদ থেকে ভারতাচার্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যে কাজ দশের অসাধ্য, মহাভারতের এই বিরাট সংস্করণ প্রকাশ ক'রে তিনি তা একের সাধ্য ব'লে প্রমাণ করেছেন। এতেও সম্ভবতঃ তাঁর বাসনার পূরণ হয়নি। তাই তিনি

মহাভারত কত বর্ষ আগে রচিত তা জ্যোতিষ-বিচারের দ্বারা নিরূপণ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ধারণ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বৎসর, পঞ্চপাণ্ডব ও দুর্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময় বিচার করেছেন; বিরোধ সমাধান করেছেন; তা ছাড়া যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ও দুর্যোধনের জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) রচনা করেছেন। প্রথমজীবনে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার তিনি করেছেন, সেই প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা মহাভারতের নায়কদের কোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন হরিদাস। তাঁর এ প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

দেব লেনে নিজ বাটীতে তিনি ১৩৪৭ সাল থেকে পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে বাস করছেন।

কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি এসে গেছে, বুঝতে পারি নি। মহাভারতের অরণ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম আমিও। সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে দাঁড়ালাম দেব লেনের অল্পালোকিত কংক্রিটের রাস্তায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রিত মূল গ্রন্থ

স্মৃতিচিন্তামণি। ব্যবস্থাগ্রন্থ

রুক্মিণী-হরণ। মহাকাব্য

বিরাজসরোজিনী। নাটিকা

বঙ্গীয়প্রতাপ। নাটক। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র

মিবারপ্রতাপ। নাটক। প্রতাপসিংহ-চরিত্র

বিয়োগবৈভব। খণ্ডকাব্য

যুধিষ্ঠিরের সময়

বিধবার অন্নকল্প

অমুদ্রিত মূল গ্রন্থ

শঙ্করসম্ভব। খণ্ডকাব্য
সরলা। গদ্যকাব্য
কংসবধ। নাটক
জানকীবিক্রম। নাটক
শিবাজী-চরিত। মহানাটক
বিদ্যাবিজ্ঞবিবাদ। খণ্ডকাব্য
বৈদিকবাদমীমাংসা। ইতিহাস
কাব্যকৌমুদী। অলংকার গ্রন্থ

মুদ্রিত টীকা-গ্রন্থ

উত্তররামচরিত। সটীকানুবাদ
মালবিকাগ্নিমিত্র। সটীকানুবাদ
মালতীমাধব। সটীকানুবাদ।
দশকুমারচরিত। সটীকানুবাদ
কাদম্বরীপূর্বার্ধ। সটীকানুবাদ
সাহিত্যদর্পণ। বিস্তৃত টীকাসমেত
মেঘদূত। সান্বয়-টীকান্বয়-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ
কুমারসম্ভব। সান্বয়-টীকা-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ
মৃচ্ছকটিক। সটীকানুবাদ
অভিজ্ঞানশকুন্তল। সটীকানুবাদ
রঘুবংশ। সান্বয়-সটীকা-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ
শিশুপাল-বধ। সান্বয়-টীকা-টিপ্পনী। বঙ্গানুবাদ
নৈষধচরিত। সান্বয়-সটীকানুবাদ
মুদ্রারাক্ষস। সটীকানুবাদ

অমুদ্রিত টীকা-গ্রন্থ

ভবভূতি কৃত মহাবীর-চরিত নাটকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ
কালিদাস কৃত বিক্রমোর্বশী নাটকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ
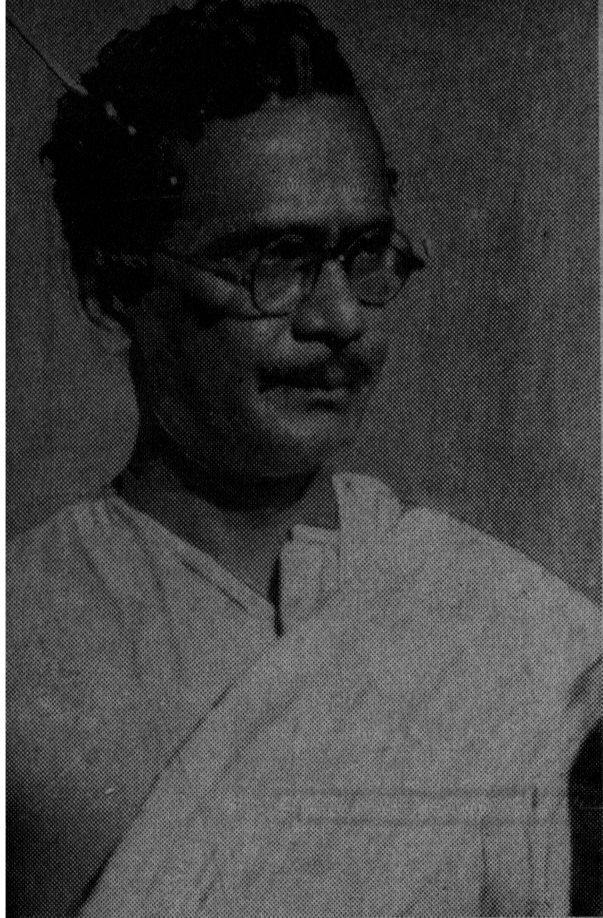
শ্রীনন্দলাল বসু

আমাদের কলরব কোলাহলের সংসারে এক-এক সময় এমন একজন মানুষ আবির্ভূত হন, যিনি নিজেকে এইসব কোলাহল থেকে সরিয়ে পরম-নির্বিকার ভাবে নীরবে দিন যাপন করতে পারেন। তপোবন তপস্যার উপযুক্তই উপবন; কিন্তু পৃথিবীর এই কোলাহলের মধ্যে ব'সেও যিনি তপ করতে পারেন, তাঁকে কেবল তপস্বী বললেই সব বলা হয় না। আমাদের এই প্রলোভনে-ভরা পৃথিবীতে নির্লোভ ও উদাসীন মানুষের অভাব আছে; সে অভাব পূরণ করার জন্যে মাঝে-মাঝে এক-এক জন আশ্চর্য মানুষের আবির্ভাব ঘটে—যিনি সব লোভকে উপেক্ষা ক'রে নিজের মনে নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজের কাজ ক'রে যান; সে কাজের দিকে পাঁচ জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক বা না হোক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ তাঁর নেই। যখন পাঁচ জনে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রচারের জন্যে প্রতিযোগে রত, তখন এই নির্বিকার পুরুষটি আপন মনে বসে বসে নিজের মনের মত কাজ করে যান, নিজের মনের খুশিটাকেই তিনি নিজের কৃতিত্বের নিরিখ ব'লে মনে করেন। এই মানুষ নীরব স্তব্ধ ও মৌন, নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের প্রকৃতির আশ্চর্য রকম মিতালি, তাই জনতার থেকে নিজেকে তফাতে রেখে তিনি প্রকৃতির তপস্যা করেন। এমনি এক অদ্ভুত মানুষ হচ্ছেন শিল্পী নন্দলাল—শ্রীনন্দলাল বসু।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এই শিল্পীর মনের উপযোগী স্থান, তাঁর জীবনের এটা যেন শান্তির নিকেতন। ১৯২১ সাল থেকে নন্দলালের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিবিড় আত্মীয়তা। এই স্থানটিকে তিনি

যেন পেয়েছেন তাঁর আত্মার আত্মীয়রূপে। এখানকার নিভৃত পরিবেশ, উদার নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, শালতালতরুশ্রেণী, এবং এঁকেবেঁকে-ছাড়া রাঙা-মাটির পথ শিল্পীর মনকে যেন একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির দুলাল নন্দলাল এই মনোরম পরিবেশে বসে মনের খুশিতে চর্চা করে চলেছেন শিল্পের। এই নিভৃত নিকেতনের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর খ্যাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কিন্তু তবুও তিনি নীরব, তিনি মৌন। নিজের খ্যাতি সম্বন্ধেও যেন উদাসীন। আপন মনে তিনি ধ্যান করে চলেছেন। কিসের এই ধ্যান? শিল্পের প্রতি তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় প্রণত হয়ে আছে, দু-চোখে সেই বিনীত নমস্কারের ছায়াই যেন ধ্যানের রূপে দেখা দেয়।

কথা বলেন খুব কম, স্বভাব অত্যন্ত লাজুক, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা হলে সংকোচে জড়িত হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া এই জন্যে সহজ নয়।

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের আচার্য হিসেবে জহরলাল নেহরু শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি কলাভবনে গেলেন, কিন্তু কলাভবনের যিনি অধ্যক্ষ সেই নন্দলালই তখন সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পরে নন্দলালকে নিয়ে আসা হল। জহরলাল সানন্দে নন্দলালকে দু-হাত দিয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন। কেমন আছেন, শরীর ভালো তো?' এই আন্তরিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নন্দলাল যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।—এই ঘটনা থেকেই নন্দলালের লাজুক স্বভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিমানহীন আড়ম্বরহীন একটি অতি সহজ জীবন যাপন করে চলেছেন নন্দলাল। আমাদের কলকোলাহলে-ভরা পৃথিবীর সামান্যতম ছায়া এসে পড়ে নি তাঁর জীবনে কিংবা কর্মে। তিনি যেন নিসর্গেরই নন্দন,

এবং নিসর্গ ই যেন তাঁর কাছে ভূস্বর্গ। এই জন্যেই তাঁর ধ্যানী মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি বুঝি স্বর্গসুখে বিভোর হয়ে আছেন। বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর উদাসীনতার কারণ সম্ভবত এই।

বলা যায়, তুলির শিক্ষা তাঁর আছে, বুলির শিক্ষা নেই। মুখে তাই কথা নেই, কিন্তু তাঁর তুলি তাঁর হৃদয়ের অজস্র কথা অনবরত ব'লে চলেছে। ভারতের চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে তাঁর দানের কথা ভারত তাই কখনো বিস্মিত হবে না। তিনি কেবল ভারতের শিল্পী নন্, তার চেয়েও বড় কথা তিনি একজন ভারতীয় শিল্পী। ভারতের আত্মার বাণী তাঁর নিজের হৃদয়ের বাণী হয়ে তাঁর তুলির রেখায় রেখায় মুখর হয়ে উঠেছে। এই জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে সসম্ভ্রম নমস্কার করে। সারা ভারতের প্রতিনিধিরূপে জহরলাল নেহরু এই জন্যেই নন্দলালকে সেদিন অভিবাদন জানিয়ে গেলেন।

স্কুল-কলেজে পড়ার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে নন্দলাল আদৌ বিদ্বান নন্, যেমন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। তিনি এফ.-এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তার পর কলেজের পাঠ ত্যাগ ক'রে তিনি শিল্পসাধনার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

নন্দলালেরর জন্ম মুঙ্গের-খড়্গপুরে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। এখানে তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু খাল-খননের কাজের পরিদর্শক ছিলেন। এই সময় শ্রীরাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলের দ্বারভাঙ্গা-স্টেটের নায়েব। কিছুদিন পরে চন্দ্রশেখর বসুর সুপারিশে নন্দলালের পিতা দ্বারভাঙ্গা রাজস্টেটের স্থপতি নিযুক্ত হন। নন্দলালের জননী ক্ষেত্রমণিও ছিলেন সুরুচিসম্পন্না—নক্শী-কাঁথা সেলাইয়ে তিনি ছিলেন নিপুণা; খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতেন।

বালক-নন্দলালের জীবনে পিতার ও মাতার প্রভাব পড়ে। তার উপর সে সময় তিনি একটি উন্মুক্ত উদার পরিবেশ লাভ করেন—দিগন্তবিস্তৃত

প্রান্তরে ও সীমাহীন সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে তাঁর জীবন বিকশিত হয়ে উঠবার জন্যে ব্যাকুল হয়। তিনি নিবিষ্ট মনে ব'সে বসে কুমোরদের মূর্তি-রচনার কাজ দেখতেন; দেখতেন, এক-এক পিণ্ড মাটি কেবল আঙুলের চাপের কারসাজিতে কি ভাবে এক-একটা আকার লাভ করছে। নন্দলালও কাদা নিয়ে বসলেন। কুমোরদের দেখাদেখি মূর্তি-গড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁর হাতের মাটির ডেলা সত্যিই একটা মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে উঠল। বালক-নন্দলাল সম্ভবত নিজের হাতের কাজ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। উত্তরজীবনে সামান্য এই মাটির কাজ যে খাঁটি শিল্পের পথ ধ'রে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথা হয়তো তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মনকে তিনি চিনেছিলেন; চিনেছিলেন যে, এ মন ধরাবাঁধা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবার মন নয়; এ মন একটা বেআড়া মন; সোজা আর সহজ পথ ধ'রে যাবার চেয়ে বাধা আর সাধনার পথ ধ'রে চলাতেই এর টান।

দ্বারাভাঙ্গাতেই তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। সেখান থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো। এখানে এসে তিনি ভর্তি হলেন সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলের ছাত্র তিনি, কিন্তু পুঁথির পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন নেই, তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যত্র। সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ের ব্যাকরণ জানার চেয়ে সেই বইয়ের গল্পের পাশে চিত্র-রচনাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। এখান থেকে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। এনট্রান্স পাশ ক'রে তিনি মেট্রপলিটনে (বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হলেন। কিন্তু এফ. এ. পাশ করা আর হয়ে উঠল না। কী ক'রে হবে। পাঠ্য কেতাবে তাঁর মন কিছুতেই বসত না। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার পাশে রঙিন চিত্রভাষ্য রচনা করতেন বসে বসে। চিত্র-সংবলিত তাঁর এই বইটি পরবর্তী

কালে বিলেতে রোদেনস্টাইনের কাছে নাকি পাঠানো হয়। ওয়াড্‌সওয়ার্থের কাব্যের উপযুক্ত চিত্রই সম্ভবত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

এফ. এ. তিনি দু'বার ফেল করেন। অভিভাবকরা স্থির করলেন, তাকে অন্য কোনো বিষয়ে পড়ানোই ভালো। চিরাচরিত পাঠে তাঁর হয়তো মন বসছে না। তাই তাকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্যে চেষ্টা করা হল, কিন্তু কলেজে ভর্তি করানো সম্ভব হল না। অগত্যা, অন্য দিক দেখতে হল। নন্দলালকে ভর্তি করা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগে।

বাণিজ্যে নাকি লক্ষ্মী বাস করেন। লক্ষ্মীর আরাধনা করার অভিপ্রায় ছিল না নন্দলালের। তাই বাণিজ্যে তাঁর মন ধরল না। যার চোখের ইশারা তিনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন, তিনি অন্য আর এক দেবী। মনে মনে হয়তো এতদিন নন্দলাল এঁরই উদ্দেশে বলে গেছেন—

যদি এতটুকু পাই ওই আঁখি ইশারা
হব নিমেষেই নির্ঘাৎ লক্ষ্মীছাড়া।

অর্থকরী বিদ্যার নিকেতন ত্যাগ করে তিনি অনর্থকরী বিদ্যার প্রতি ধাওয়া করলেন।

বাণিজ্য-কলেজের পাঠের জন্যে বই-কেনার টাকা অন্যভাবে ব্যয় হতে লাগল। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি নানা শিল্পীর ছবি সম্বলিত সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন সেই টাকা দিয়ে। র‍্যাফায়েলের ছবি ও রবি বর্মার ছবি অনেক সংগ্রহ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, বাণিজ্য-ক্লাশ ছেড়ে দিয়ে আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে হবে।

নন্দলালের পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। নন্দলাল তাই তাঁর এই ভ্রাতার কাছ থেকে অঙ্কনের দু-একটা পদ্ধতি শিখতে লাগলেন বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন,

অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকী স্বভাবের কথা এবং অমায়িক ব্যবহারের গল্পও, তিনি শুনেছেন। অবনীন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর মনের মধ্যে স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে; এমন সময় একদিন তিনি সত্যেন বটব্যাল নামে আর্টস্কুলের এক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে।

'পড়াশুনায় কিছু হল না বুঝি? তাই এসেছ ছবি আঁকা শিখতে?' অবনীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম সম্ভাষণ।

এই তিরস্কার কৃত্রিম, নন্দলাল তা বুঝতে পারলেন। তাই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নন্দলালকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, লেখাপড়া কতদূর করা হয়েছে। এনট্রান্স পাশ শুনে তার সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন।

সার্টিফিকেট নন্দলালের কাছে ছিল না। অনেক চেষ্টায় আর তদ্বিরে তা উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে নিজের আঁকা এক বাণ্ডিল ছবি নিয়ে নন্দলাল চললেন আর্টস্কুলে। নিজের আঁকা ছবির মধ্যে কয়েকটা তাঁর মৌলিক আঁকা ছবি, কয়েকটা বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবির নকল। আর্টস্কুলে গিয়ে তাঁকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হল প্রিন্সিপাল হ্যাভেলের। হ্যাভেল ছবিগুলি দেখতে চাইলেন। নকল-করা ছবিগুলি পছন্দ হল না হ্যাভেলের, তিনি ঐ গাদা থেকে বেছে বা'র করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবির একটা— মহাশ্বেতা। এই অঙ্কন দেখে খুশি হলেন প্রিন্সিপাল। তবুও রেহাই নেই। তাঁকে পরীক্ষা করা হল। মন থেকে আঁকতে বলা হল একটা ছবি। নন্দলাল আঁকলেন—সিদ্ধিদাতা গণেশ।

ছবিটা অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথ জানালেন হাত পাকাই আছে। এর ফলে সিদ্ধিলাভ করলেন নন্দলাল। এটা

হল তাঁর সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপান। তিনি যেন তাঁর যশের মন্দিরের একটি ধাপ উঠে এলেন সেইদিন। নন্দলাল ভর্তি হলেন আর্টস্কুলে।

এনট্রান্স পাশ করার পরের বছরই নন্দলালের বিবাহ হয়। জামাতার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে শ্বশুরকুল বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যে বিদ্যা লাভ করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ জীবনে অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা পাবার সম্ভাবনা, সেই পথ পরিত্যাগ করে নন্দলাল কিনা একটা অর্বাচীন পথের যাত্রী হলেন! কিন্তু তাঁদের দুশ্চিন্তায় সান্ত্বনা দেবার ভাষা নন্দলালের জানা ছিল না। তিনি তখন তাঁর অশান্ত জীবনকে প্রবোধ দেবার পথ পেয়ে গেছেন—এইটেই তাঁর কাছে তখন বড় কথা। তিনি তাঁর জীবনের সাধ মেটাবার জন্য নিজেকে নিয়ে তখন ব্যস্ত।

নন্দলাল কিছুদিন ডিজাইনের ক্লাশে শিক্ষালাভ ক'রে সরাসরি এসে গেলেন অবনীন্দ্রনাথের ক্লাশে। এ ক্লাশের আবহাওয়াই ছিল আলাদা। শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল না, ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। গল্পের আনন্দের ও বৈঠকের মধ্যে দিয়ে নন্দলালের শিল্প-শিক্ষা চলতে লাগল। নন্দলাল ক্রমশ কয়েকটি চিত্র আঁকলেন—শরাহত মরাল-ক্রোড়ে শোকার্ত সিদ্ধার্থ, সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, কর্ণ, নটরাজের তাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি।

ভগিনী নিবেদিতা এই সময় একদিন আর্টস্কুলে এসে তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর শিল্পের সঙ্গেও। নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র দেখে নিবেদিতা অভিভূত হন, এবং তাঁর চোখে চিত্রের মধ্যে যা ত্রুটি বলে তাঁর বোধ হয়েছিল অপকটে তা উল্লেখ করেন। নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় আঁকা উপরোক্ত ছবি উত্তরকালে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর তুলি প্রথম অবস্থা

থেকেই তাঁর বশে ছিল কতখানি। নন্দলালের মন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় মন, এতে আর সন্দেহ কি। তাঁর চিত্রের বিষয়-নির্বাচন থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

নন্দলাল আর্টস্কুলে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই সময় স্কুল থেকে বৃত্তিও লাভ করেন।

নন্দলালের আর্টস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুল ছেড়ে যান। পার্সি ব্রাউন তখন আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি নন্দলালকে আর্টস্কুলেই শিক্ষকতার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। ওদিকে অবনীন্দ্রনাথ অনুরোধ পাঠালেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে চিত্রাঙ্কন করার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথের আহ্বান এড়ানো অসম্ভব। ছাত্র এসে উপস্থিত হলেন গুরুর পার্শ্বে। বছর তিন নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে এখানে ছবি-আঁকায় রত থাকেন। এই সময় নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার *Indian Myths of Hindoos and Buddhists* বইয়ের চিত্র অঙ্কন করেন।

যে ভারতীয় সাহিত্যের ও পুরাণকাহিনীর দ্বারা তাঁর মন আচ্ছন্ন, এবং যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিত্রে, এবার নন্দলাল বহির্গত হলেন সেই ভারত-সন্দর্শনে, ভারতভ্রমণে। ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত শিবসতী চিত্রটি প্রদর্শিত হবার পর তিনি পুরস্কারস্বরূপ পেলেন পাঁচ শ টাকা। সেই টাকা তিনি ব্যয় করলেন সৎ কাজে। পাটনা গয়া কাশী আগ্রা দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি ভারতীয় শিল্পকীর্তির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে মনের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে এলেন। তার পর পুনরায় গেলেন দক্ষিণ-ভারতে, তার পর কোনারকে। সারা ভারত ঘুরে তিনি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি ও শিল্পকীর্তি দেখে মনের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তুললেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। সম্ভবত সেটা ১৯১০ সাল। বিলেত থেকে বৃদ্ধা লেডি হেরিংহ্যাম এলেন ভারতে। অজন্তা-গুহাচিত্র নকল করার জন্যে। ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে তরুণ শিল্পী তাঁর সঙ্গে গেলেন এই কাজের সহকারী [illegible]। এইখানে এসেই নন্দলালের ভারতীয় মন যেন একটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করল, এবং তাঁর মন ভারতীয় ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল।

এর পর নন্দলাল করেন আর-একটি কাজ। ১৯১৯ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির অলংকৃত করেন মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত করে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩২১এর বৈশাখে) নন্দলাল সর্বপ্রথম যান শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিভৃত পরিবেশটি দেখে তাঁর মন অভিভূত হয়। কিন্তু তিনি তখন সেখানে থাকার জন্যে যান নি। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় বসে নন্দলাল যখন অঙ্কনে রত ছিলেন, তখন পিছন থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে তাঁকে শান্তি-নিকেতনের সাধন-কেন্দ্রে যাবার জন্যে বললেন। কবির আহ্বানে নন্দলাল রাজি হলেন, তিনি শান্তিনিকেতনে গেলেন। তখন সেখানে কলাভবন গড়ে উঠছে। নন্দলাল সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু কলকাতায় তখন অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন সোসাইটি বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যকে ডেকে নিলেন এই কাজে। নন্দলালকে ছাড়তে হল ব'লে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ ক'রে তখন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন— 'আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে তুমি সে চূড়া ভেঙে দিলে।'

কিন্তু এ চূড়া ভাঙবার নয়, এ চূড়া অভ্রভেদী হয়ে উঠবেই—এই ছিল কালের নির্দেশ। কিছুদিন পরে নন্দলাল ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের

কলাভবনে। সম্ভবত ১৯২৩ সালে। নন্দলাল তাঁর সাধনার জন্যে এই কলাভবনকে একটি তপোবন-রূপে মনে মনে গ্রহণ করলেন।

এখানে আসবার কিছুদিন আগে তিনি বাগ-গুহায় ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে যান।

১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত তিনি ঘুরে আসেন। তার পর যান সিংহলে। তাঁর মনের ঐশ্বর্য এবং অভিজ্ঞতার পরিধি এতে ক্রমশই বিস্তারলাভ করতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন, কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে তিনি কারুময় মঞ্চ ও তোরণ রচনা করেন, কংগ্রেসের পল্লী অধিবেশনে তিনি পল্লীজীবনের বিভিন্ন দিক রূপায়িত করেন।

নিজের দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কতটা নিবিড় তাঁর অঙ্কিত এইসব চিত্র দেখে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই জন্যই স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাণ্ডুলিপি অলংকৃত করার ভার অর্পিত হয় নন্দলালের উপর। তাঁর নেতৃত্বে এই সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণ অলংকৃত হয়েছে, কয়েকটি চিত্র তিনি স্বয়ং রচনাও করেছেন।

নন্দলাল দীর্ঘজীবনের সাধনায় নিবিষ্ট থেকে যে অগণিত চিত্র রচনা করেছেন তার তুলনায় তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে খুব কম। কয়েক বছর আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী করেন; তারপর কিছুদিন আগে বোম্বাইতে এক প্রদর্শনী হয়। আজকাল সাময়িক পত্রিকাদিতেও এঁর রচিত চিত্র বিশেষ মুদ্রিত হয় না, কেবলমাত্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাড়া। এই জন্যে বর্তমান কালের অনেকের পক্ষে তাঁর চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তেমন সম্ভব নয়। তাছাড়া,

আজকাল কোনো প্রকাশককেও তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না। এসব আক্ষেপেরই কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো ভালো না। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন। তাঁর লেখনী নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী।'

সেই যাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে চলেছে নন্দলালের তুলিকা। সুদূর ভবিষ্যতকালের দিকে তিনি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে আছেন।—যে কাল এখনো অনাগত. কিন্তু যে কাল তাঁর আয়ত্ত।

রচিত গ্রন্থাবলী

শিল্পকথা
শিল্পচর্চা
রূপাবলী। ৩ খণ্ড
ফুলকারী। ৩ খণ্ড
Ornamental Art
Pictures from the life of Buddha
Paintings
Six Sketches of Nandalal Bose

চিত্রিত গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজ পাঠ। ২ খণ্ড
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছড়ার ছবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৩৫৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। 'বিচিত্রা', ১৩৩৪ আষাঢ়
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, টাকডুমাডুম ডুম। ১৩৫১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুড়ো আংলা

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আরও কোনো কোনো গ্রন্থে নন্দলাল-অঙ্কিত অনেক চিত্র আছে।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ল্যাপল্যাণ্ড দেশটি দেখি নি, শুনেছি সে দেশটি নাকি অত্যন্ত কুস্থান। অবশ্য যে কবি একে কুস্থান বলেছেন, তাঁর চোখে ঐ দেশটি হয়তো মনোরম ঠেকে নি। কিন্তু কবিই বলেছেন যে, সে দেশ যত কদর্যই হোক সেই দেশের নিবাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই জানা যাবে যে 'তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে!' একে অন্ধ দেশপ্রীতি বলে অবহেলা করা চলে না; আসলে নিজের দেশ সম্বন্ধে যারা উদাসীন, অবহেলার পাত্র তারাই। পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে এমন-একটি মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না—যিনি নিজের দেশকে অবজ্ঞা করে জীবনে সফলকাম হতে বা কারো শ্রদ্ধার পাত্র হতে পেরেছেন। অথ স্বদেশ-জিজ্ঞাসা কথাটির মধ্যেই অথ আত্মজিজ্ঞাসা কথাটিও নিহিত আছে বলে মনে হয়।

যাঁরা এই স্বদেশজিজ্ঞাসায় ধ্যানস্থ রাখতে পেরেছেন নিজেদের, তাঁরা আমাদের নমস্য। কেবল আমাদের নয়, তাঁরাই দেশের ও বিদেশেরও নমস্য। এই স্বদেশজিজ্ঞাসীকে তাই নমস্কার করে স্বদেশ ও পরদেশ উভয়েই।

'আমার ভারতবর্ষ তুমি' বলে যেদিন আমরা ভারতের ভূমিকে প্রীতির শৃঙ্খল দিয়ে নিজের আত্মার সঙ্গে বাঁধতে শিখব, আমাদের আত্মার উন্নতি হবে সেই দিন, এবং সেই দিন আমাদের স্বদেশের উন্নতি দেখতে পাব আমরা চাক্ষুষ। আমাদের বিবেক সেই দিন আনন্দলাভ করতে পারবে। 'ভারতের ধূলিকণা আমার স্বর্গ'—স্বামী বিবেকানন্দের এই সোল্লাস উক্তির প্রতিধ্বনি যেদিন চারদিকে বেজে উঠবে, সেই দিন সত্যসত্যই স্বর্গে পরিণত হবে এই ভারতবর্ষ।
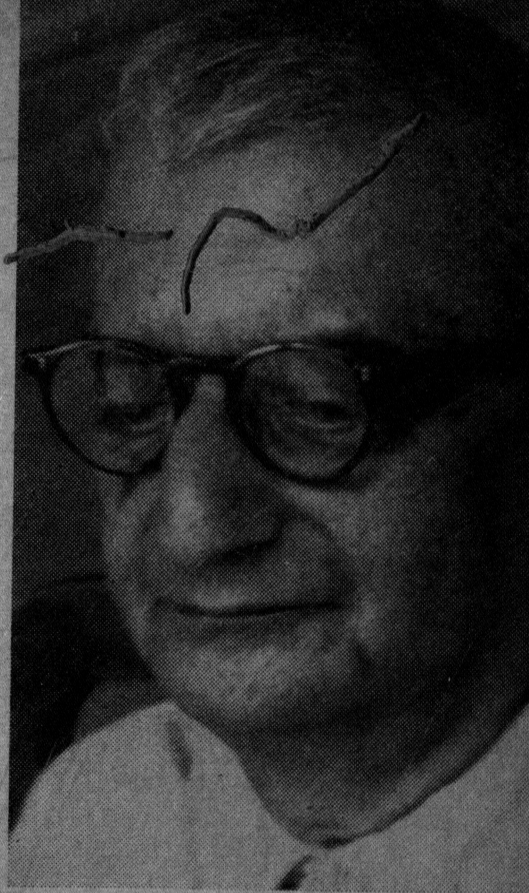
নিজের দেশকে জানবার প্রাথমিক উপায় নিজের দেশের ইতিহাস জানা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করে ভারতের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য। এই নমস্যদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

১৯শে মার্চ ১৯৫৩, ৫ই চৈত্র ১৩৫৯। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বালীগঞ্জের একডালিয়া রোডে। ট্রাম আর বাস্ চলাচলের সদর রাস্তার উপরে বাড়ি। সকাল বেলা। কলরব-কোলাহল তাই তখনো শুরু হয় নি।

অতি ছোটখাটো দেখতে মানুষটি, অতি সাদাসিধে। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না।

বললেন, "আমার জন্ম ১৮৮৪ (বঙ্গাব্দ ১২৯০) সালে। কোষ্ঠী হারিয়ে গেছে, তাই মাস-তারিখ কিছু বলতে পারছি নে।"

একটু থামলেন, হেসে বললেন, "যাদের কোষ্ঠী হারিয়ে যায় তাদের কী বিপদ।"

ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধার করে জীবন কাটালেন ইনি, কত সন-তারিখের অরণ্যে পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হয়েছে এঁকে, উদ্ধার করতে হয়েছে কত ঐতিহাসিক পুরুষের জন্ম-ঠিকুজি। এত-কিছু রক্ষা করেছেন, কিন্তু নিজেরটাই ফেলেছেন হারিয়ে। তাই তাঁর কথা শুনে অন্য কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ল যিশুখ্রীস্টের কথা। কত জীবকে তিনি ত্রাণ করলেন, কিন্তু নিজেকে পরিত্রাণ করতে পারলেন না—

He saved others but Himself He could not save.

কথাটি মনে পড়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর অন্য কথা শোনার জন্যে তৈরি হয়ে বসলাম।

বললেন, "আমার পিতার নাম স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তিনি উকিল ছিলেন। আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় সেখানেই।"

ইতিহাসের প্রতি ডক্টর রাধাকুমুদ যে অনুরক্ত হয়েছেন, সে অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন। তাঁর পিতার ছাত্রজীবন ছিল কৃতিত্বপূর্ণ—তারপর তিনি যখন আইনজীবীরূপে জীবন আরম্ভ করেন তখনও তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এরই ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে টেগোর ল প্রফেসর রূপে নিয়োগ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই পদে যোগ দেবার আগেই পরলোকগমন করেন।

বহরমপুরে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে রাধাকুমুদ কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম গ্রেডের সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি একটি নূতন রেকর্ডও স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে দুটি বিষয়ে অনার্সসহ তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং ঐ সালেই ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি ও অর্থনীতিতে কবডেন পদক পান। এর পর বৎসর ১৯০২ সালে তিনি ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন। ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন; এই বৃত্তির সাত হাজার টাকার সঙ্গে তিনি একটি স্বর্ণপদকও পান। ১৯১৫ সালে তিনি পি. এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

সংক্ষেপে এই হল তাঁর ছাত্রজীবন। এই জীবনের মধ্যে তিনি যে অসাধারণতা দেখাতে পেরেছেন, তার থেকেই তাঁর উত্তরজীবন সম্বন্ধে সে সময় অনেকের মনেই আশার সঞ্চার হয়। তিনি তাঁদের সে আশার অতিরিক্ত ভরসা দিতে পেরেছেন তাঁর জীবনের নিষ্ঠা ও শ্রমের দ্বারা।

এবার কর্মজীবনে প্রকাশ করলেন রাধাকুমুদ। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করার আগেই ১৯০৩ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন কলকাতার রিপন কলেজে, এবং কিছুদিন পরেই কলকাতার বিশপ কলেজে।

বছর তিনেক পরে তিনি বাংলার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতাধীনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে। এর পর তিনি যান কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৬ সালে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, এ অধ্যাপক-পদটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। এর পর যান মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে।

এইভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি বিদ্যা বিতরণ করে চলেছেন, বিদ্যাবিতরণের সঙ্গেসঙ্গে তিনি বিদ্যা-অর্জনও করে চললেন, জ্ঞান-আহরণও হতে লাগল সেই সঙ্গেসঙ্গে। নিজের দেশকে জানতে হলে কেবল পুঁথিপাঠের দ্বারাই তা সম্ভব নয়, তার ধূলিকণার সঙ্গে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ও তার অধিবাসীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকাও দরকার। রাধাকুমুদ অধ্যাপকরূপে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে লাগলেন। ভারতের মাটির ও মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল ক্রমশ। এই আত্মীয়তার দ্বারা তিনি আত্মস্থ করে নিলেন ভারতভূমিকে। তাই দেশ এবং বিদেশ তাঁকে আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনী-গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত 'বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দি ওয়ার্লড'এ পৃথিবীর সেরা বিশিষ্ট

ব্যক্তিদেব জীবনী-সংকলনে তাই রাধাকুমুদেরও জীবনী সংকলিত হয়েছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই বছরই তিনি আসেন লখনউ। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাসেব অধ্যাপক এবং উক্ত বিভাগেব প্রধানরূপে যোগ দেন। এইবাব তাঁব জীবনে যেন এল স্থিতি। এখানেই তিনি অধ্যাপনা-জীবন অতিবাহিত করেন।

ভাবতেব ইতিহাসে ডক্টব বাধাকুমুদেব দান অসামান্য। ভাবতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধাবেব ও প্রসাবেব জন্যে তিনি বিশেষভাবে কাজ করেছেন। বর্তমানের পৃথিবীব কাছে ভাবতেব আজ যে মর্যাদা তাব মূলে আছে ভাবতের গৌববময় অতীত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ। সেই অতীতেব সঙ্গে পবিচয়-সাধনেব জন্যে যাবা বিশেষভাবে প্রয়াস করেছেন বাধাকুমুদ তাঁদের মধ্যেব একজন। তিনি যে আজ দেশে এবং বিদেশে অভিনন্দিত হচ্ছেন, তাব হেতু তাঁব এই স্বদেশপ্রাণতা।

তাঁব ঐতিহাসিক গবেষণাব ধাবা ও প্রণালী দেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর ভিনসেণ্ট স্মিথ উচ্ছসিত প্রশংসা কবে বলেছেন যে, ডক্টব রাধাকুমুদ কঠোব পবিশ্রমের দ্বাবা যেসব তথ্য উদ্ধার কবেছেন, সেইসব তথ্য ডক্টব স্মিথ তাঁব নিজেব লেখা বই *Early History*ব পরবর্তী সংস্কবণে ভুক্ত কবতে পাবলে ধন্য হবেন।

বিদেশী ঐতিহাসিকেব দৃষ্টিই নয় স্বদেশেব নায়কগণও তাঁব গবেষণার দ্বারা আকৃষ্ট হন। ডক্টব বাধাকৃষ্ণন, শ্রীমতী সবোজিনী নাইডু ও অন্যান্য অনেকে ভূয়সী প্রশংসা কবেন বাধাকুমুদেব।

তাঁব গবেষণায় প্রীত ও আকৃষ্ট হয়ে ববোদা সরকার তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁব পবিচয় সেখানেই। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস-শিরোমণি' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

লখনউতে তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তখনো ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এসেছে ক্রমাগত। মহীশূর কাশী পঞ্জাব কলকাতা বোম্বাই আন্নামালাই মাদ্রাজ নাগপুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের জন্যে আহূত হয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন।

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের সঙ্গেসঙ্গে চলেছিল আরও একটি জীবন। সে হচ্ছে তাঁর কর্মী-জীবন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারত যখন জাতীয় আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে ওঠে ডক্টর রাধাকুমুদ তখন সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রচারকরূপে বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেন।

১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের (উর্ধ্বতন পরিষদ) সদস্য ও বিরোধী পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ FAO Preparatory Commission at Washingtonএ ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে ইনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন।

বর্তমানে রাধাকুমুদ ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রচারকরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত ও পরিগণিত। তিনি অনলস গবেষণার দ্বারা যেসকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তার জন্যেই তিনি আজ বন্দিত। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর সমকক্ষ পাওয়া দুরূহ। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নূতন দৃষ্টির সঞ্চার করেছেন, সেই নূতন দৃষ্টিতে সেই ছাত্রবৃন্দ ভারত-ইতিহাস

লক্ষ্য ক'রে নূতন জ্ঞানালোক দেখতে পেয়েছে। তাঁর অধ্যাপনা-জীবনকে তাই প্রচারক-জীবনও বলা চলে। দেশের ইতিহাসের এবং দেশের মাটির খবর রাখাই যে সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং জীবনে মর্যাদালাভের প্রকৃষ্টতম পথ—এই সংবাদ বিতরণ ক'রে গিয়েছেন রাধাকুমুদ তাঁর কাজের দ্বারা এবং কথার দ্বারা।

অতি সহজ ও সাধারণ জীবন যাঁর, তাঁরই জীবনে মনন সম্ভব। রাধাকুমুদ তাঁর জীবনকে মননের উপযুক্ত করেই গড়ে তুলেছেন ধীরে ধীরে। বিনয়ে তিনি নম্র। এই নম্রতা দেখে মনে হয়, বুঝি-বা জীবনকে নমণীয় না করলে জীবন রমণীয়ও যেমন হয় না, তেমনি কৃতার্থও হয়ে ওঠে না। দেশের মাটির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ না থাকলে এই কোমলতা অর্জন করা কঠিন। রাধাকুমুদ নিজের দেশের মাটিকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসতে জানেন ব'লেই তিনি আজ ভারতবাসীর প্রিয়জন।

তাঁর এই নিষ্ঠা ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ অথবা হয়তো কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেই তাঁর অনুরাগিগণ ১৯৪২ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনের সময় স্থির করেন যে রাধাকুমুদকে তাঁরা একটি গ্রন্থ (Volume of Studies) উপহার দেবেন এবং তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে একটি লেকচারশিপের ব্যবস্থা করবেন। এর জন্যে একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়—তার জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকার দরকার এইরূপ স্থির হয়। এর জন্যে যে আবেদন প্রচারিত হয় তাতে স্বাক্ষর করেন ভারতের সর্বক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এর দ্বারাই তাঁর সর্বভারতীয় মর্যাদা সূচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে কাজও হয়েছে। তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাঁকে 'ভারত-কৌমুদী' নামে পাঁচ শ পাতার বৃহৎ একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়েছে—

এই গ্রন্থে রচনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দেশের ও বিদেশের বিদ্বজ্জন। এই গ্রন্থ একটি সম্পদবিশেষ। সর্বভারতের বন্দনা যিনি লাভ করেছেন, তিনি সত্যই ভারত-কৌমুদী। এই গ্রন্থটির নামও সেই জন্যে সার্থক।

রচিত গ্রন্থাবলী

The History of Indian Shipping

The Fundamental Unity of India

Local Government in Ancient India

Nationalism in Hindu Culture

Men and Thought in Ancient India

Hindu Civilization

Asoke

Harsha

Ancient Indian Education

Chandragupta Maurya and His Times

Gupta Empire

Early Indian Art

Asokan Inscriptions

India's Land System

A New approach to the Communal Problem

Akhand Bharat

The University of Nalanda

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেই ভারতবর্ষ ছিল একটি সমৃদ্ধ এবং সুসভ্য দেশ। এই দেশের অধিবাসীরা ভারতের পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতের সেই স্বর্ণযুগের বহু সাক্ষ্য এখনো এইসব দ্বীপাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টি ভারতের এই স্বর্ণযুগের উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। তিনি অতীত মন্থন করে সুসভ্য প্রাচীন ভারতের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধারেই বিশেষভাবে লিপ্ত।

মালয়, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিয়ো, বলি ইত্যাদি দেশে ও দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, রমেশচন্দ্র তার আনুপূর্বিক ইতিহাস উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষ করে এই কারণেই তাঁকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানায়।

সর্বকালে এবং সর্বদেশে যা ঘটে থাকে ভারতেও তাই ঘটেছিল। ধন-অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় অভিযানে বহির্গত হয়েছিল ভারতীয় সন্তানেরা। তার নিজের দেশের সীমানার বাহিরেও কোথায় আছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, সেই অনুসন্ধানে রত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের বণিক। তারা জানতে পেরেছিল, ভারতের পূর্বদিকে ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত যে অগণিত দ্বীপ আছে, সেইসব দ্বীপ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের এবং মহার্ঘ খনিজ পদার্থের আধার। এইজন্যে তারা এইসব দেশের নাম দেয় সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপ। ধন-অর্জনের স্পৃহা ব্যতীত অন্য কারণেও সেকালের ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে। সে কারণ হচ্ছে ধর্মপ্রচার করা। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যাজকেরা ধর্মের বার্তা নিয়েও ক্রমে ক্রমে দূরপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

উপস্থিত হয়। এইভাবে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে প্রাচ্যের এই দ্বীপপুঞ্জে। এসব ঘটনা আজের নয়, খ্রীস্টজন্মেরও আগের। খ্রীস্টীয় অব্দ আরম্ভ হবার বহু পূর্ব থেকে যেসব বৌদ্ধ জাতকের গল্প প্রচলিত আছে, সেই-সব গল্পেও ভারতবর্ষ ও এই সুবর্ণভূমির মধ্যে নৌ-চলাচলের কাহিনী পাওয়া যায়। এইসব গল্প পুরোপুরি ইতিহাস না হলেও এবং নেহাত কিংবদন্তী হলেও এদের ভিত্তি একটা আছে। সে ভিত্তি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারেরই ঘটনা। বোর্নিয়ো, জাভা, মালয় ইত্যাদি স্থানে যেসব সংস্কৃত শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে, তার থেকেই জানা গিয়েছে যে, দূরপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ও সমাজনীতি কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং স্থানীয় আচার-আচরণকে কিভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। বোর্নিয়োতে ও মালয়ে ভারতীয় দেবদেবীর বিস্তর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে— বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব গণেশ নন্দী স্কন্দ মহাকাল ইত্যাদি। এইসব মূর্তির গঠনপদ্ধতিতে ভারতীয় সুকুমার কলার নিদর্শনও সুস্পষ্ট। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ, তার পর ধীরে ধীরে সে প্রভাব তিরোহিত হয়, কিন্তু তার নিদর্শন এখনো আছে মন্দিরগাত্রে, পাষাণ-ফলকে এবং মূর্তিতে মূর্তিতে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয়, তাই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বারা এতটা আকৃষ্ট হয়েছেন। যে সুবর্ণভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল পুরাতন ভারতের বণিকেরা, ভারতের সংস্কৃতির সেই সুবর্ণভূমির প্রতি ঠিক তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন রমেশচন্দ্র। তাই তাঁর এই নূতন ঐতিহাসিক অভিযান দূরপ্রাচ্যের এই দ্বীপাবলীর দেশে।

১৯২৮ সালে তিনি বিলেত যান। সেখান থেকে ফ্রান্স জার্মানি ইটালি মিশর ঘুরে জাভা সুমাত্রা আন্নাম কম্বোডিয়া মালয় শ্যাম ও বর্মা যান।

বললেন, "জাভা ছিল ডচ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জাভার অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন ডচরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে। তাই হল্যাণ্ডে গিয়ে ডচ ভাষা শিখে কার্ন ইনস্টিটিউটে কিছুটা তথ্যাদি ঘেঁটে জাভা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে তার পর জাভা যাই। এইভাবে তথ্য জোগাড় করি। তার পর ফিরে এসে বই লিখি।"

আজ তিনি ইতিহাসে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি যে ঐতিহাসিক হবেন, এ কথা বাল্যকালে তিনি নিজেও জানতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের একটি সামান্য ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তিনি শেষবেশ ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন। বললেন, "আমার মেজদা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাই আমাকে বি. এ.-তে ইতিহাস নিতে বললেন— দু ভাই যাতে একই বিষয় না পড়ি এইজন্যে। তখন বি. এ.-তে কেবল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসই অনার্স নেওয়া যেত। তাই নিলাম। আমার মেজদা হয়ে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার, আর আমি হলাম ঐতিহাসিক।"

এর আগে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ. এ পড়েন লজিক ও স্যানিটারি সায়েন্স নিয়ে। প্রথমে ইতিহাস নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ছেড়ে দেন। বললেন, "বরিশালে পড়তে গিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার দত্তের আকর্ষণে, তার পর কলকাতায় রিপন কলেজে পড়তে আসি আর-একটি আকর্ষণে— সুরেন্দ্রনাথের কাছে পড়ব, এই ছিল আগ্রহ। তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নিয়ে দেশে সকলের মুখেই সুরেন্দ্রনাথের নাম। তাই তাঁর প্রতি আকর্ষণটা প্রবল হয়েছিল।"

১৫ই এপ্রিল ১৯৫৩, ২রা বৈশাখ ১৩৬০। বালীগঞ্জের বিপিন পাল রোডে তাঁর গৃহে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। ভালো লাগছিল, ভারতের একজন জননায়কের নামে যে-রাস্তা চিহ্নিত তাঁর গৃহটি সেই রাস্তার

উপরেই। প্রথমজীবনে তিনি অশ্বিনীকুমার ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, উত্তরজীবনে সেই আকর্ষণটাই সম্ভবত তাঁকে এনে উপস্থিত করেছে বিপিন পালের স্মৃতির সান্নিধ্যে। মানুষের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা কখনো নাকি বিফলে যায় না।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৯৫) ডিসেম্বর মাসে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত খণ্ডপাড়া গ্রামে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্বগ্রামের মধ্যইংরেজি বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তার পর কলকাতায় এসে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে পঞ্চম মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। এর পর কিছুদিনের জন্যে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ) স্কুলে পড়েন। ১৯০২ সালে তিনি ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন, তার পর হুগলি কলিজিয়েট স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন, এর পর পড়েন কলকাতায় হিন্দু স্কুলে এবং শেষবেশ ১৯০৫ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করেন কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন।

বললেন, "অনবরত স্কুল-পরিবর্তন করার দরুন স্কুলের কোনো শিক্ষকের কথা তেমন মনে পড়ে না, কারও ছাপও আমার মনের উপর পড়েছে বোধ হয় না। কেবল একজনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি খণ্ডপাড়ার গ্রাম্যস্কুলের শিক্ষক ব্রজেন্দ্রকুমার সেন।"

স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। এখানে মাত্র কিছুদিন পড়েই চলে আসেন কলকাতার রিপন কলেজে। ১৯০৭ সালে রিপন কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে এবং বৃত্তি লাভ করেন। এর পর বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে—ইতিহাসে

অনার্স নিয়ে। ১৯০৯ সালে পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ পেয়ে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। ১৯১১ সালে ইতিহাস নিয়ে এম.এ. প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন শেষ হল এখানে। এর পর শুরু হল কর্মজীবন।

১৯১৩ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। এবং ঢাকার গবর্নমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে এই পদ ত্যাগ করে তিনি লেকচারার রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি একটানা সাত বৎসর কাজ করেন। এই সময় তিনি পি.এইচ-ডি উপাধি পান ও গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা যান। ঢাকায় তিনি ফ্যাকালটি অব আর্টসের ডীন ও জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সেখানকার অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য-পদেও বৃত হন। ১৯৩৭ সালে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন, প্রায় পাঁচ বছর এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি কর্মের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন বলা যায়। এই সমুদ্রের নীচে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক রত্ন লুকানো আছে, অনুসন্ধানী ডুবুরির ঐকান্তিকতা নিয়ে তিনি সেইসব রত্নের সন্ধানে এখন ব্যাপৃত। বিস্তৃতভাবে ভারতের ইতিহাস সংকলনের জন্যে বোম্বাইয়ের ভারতীয় ইতিহাস-সমিতি যে উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন, কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে রমেশচন্দ্র সেই ইতিহাস-সম্পাদন-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দশ খণ্ডে এই সংকলন প্রকাশিত হওয়ার কথা, ইতিমধ্যে তার দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ডক্টর রাজেন্দ্র

প্রসাদ ভারত-তিহাস-সংকলনের ই যে পরিকল্পনা করেছেন, তার এক খণ্ড এবং ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেস পরিকল্পিত ইতিহাসের দুই খণ্ড সম্পাদনা করেছেন রমেশচন্দ্র।

ইংরেজিতে লিখিত বাংলার ইতিহাসের যে প্রথম খণ্ডটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়, রমেশচন্দ্র সেই বিরাট গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অধর মুখার্জি বক্তৃতা দেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সার উইলিয়ম মেয়ার বক্তৃতা দেন। তাঁর এই দুইটি বক্তৃতাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সে দুটির নাম—মহারাজা রাজবল্লভ ও কম্বোজদেশ।

এইসব ঐতিহাসিক পুঁথি সংকলন ও সম্পাদন ছাড়াও তিনি অন্যান্য কাজও করেছেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতায় তিনি দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন— রামচরিত ও রাজা-বিজয়-নাটক।

বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদন ও সংকলনের কাজ তিনি করে চলেছিলেন। এর মধ্যেই বিবিধ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। এইসব রচনার সংখ্যা এক শতেরও অধিক। বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে— অল ইণ্ডিয়া হিস্টরি কংগ্রেস ও অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স। এই দুইটিরই তিনি সভাপতি ছিলেন। অল বেঙ্গল টিচার্স কনফারেন্স ও ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স কনফারেন্সে রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইনি সহ-সভাপতি। বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের শিক্ষকদের মধ্যে তিনি একজন অবৈতনিক সভ্য। এ ছাড়া আরও যে-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল সেগুলি হচ্ছে— সেণ্ট্রাল অ্যাড-

ভাইসরি বোর্ড অব আর্কিয়োলজি, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, ইণ্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড।

১৯৫০ সালে রমেশচন্দ্র কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হয়ে সেখানে যান। সেখানে কলেজ অব ইণ্ডোলজির প্রিন্সিপাল রূপে ইনি ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন।

বর্তমানে তাঁর উপর অনেকগুলি কাজের ভার অর্পিত হয়েছে। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ১৯৫৩ সালের জন্য সয়াজিরাও গায়কোয়াড় লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন—এই লেকচার রচনায় তিনি বর্তমানে ব্যস্ত আছেন। বললেন, "ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এই ক্ষমতার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, আস্থাও আছে। ইতিহাসেও এর প্রমাণের অভাব নেই। মুসলমানেরা তাদের অভিযান আরম্ভ করার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়, কিন্তু তাদের ভারত-অধিকার অত সহজে হয় নি। এই দেশ অধিকার করতে তাদের লেগেছিল ছয় শ' বছর। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতার বিষয় হবে এই— ভারতবাসীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা।"

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার উদ্যোগী হয়েছেন, রমেশচন্দ্র এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বললেন, "ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেই আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে আমি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, অনতিবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি ইতিহাস রচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্টের কাছে আমি একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে বলি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা কতটা অংশ গ্রহণ করেছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দরকার। দুঃখের বিষয়, পশ্চিম-বাংলার গবর্নমেণ্ট আমার এ প্রস্তাবে বিশেষ কোনো কান দেন না।

অবশেষে জনকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমার প্রবন্ধটির নকল ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে পাঠান। এর পর এ বিষয়ে সাড়া পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশনের কাছেও আমি অনুরূপ প্রস্তাব দাখিল করি। অবশেষে ভারত সরকার এই কাজের জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করেন এবং বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্যে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। আমি এই সম্পাদক-মণ্ডলীর একজন সদস্য।"

বলেছি, রমেশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয়। কেবল ভারতভূমিতে জন্মলাভ করলেই ভারতীয় হওয়া যায় না. ভারতের আত্মার এবং ভারতের মৃত্তিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকলেই অকৃত্রিম ভারত-সন্তান হওয়া যায়। কৃত্রিমতায় ভরা এই পৃথিবীতে এইরূপ অকৃত্রিম মানুষ পাওয়া কঠিন। রমেশচন্দ্রকে পেয়ে তাই আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। তিনি পুরাতন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টেই তাঁর জীবনের কর্তব্য শেষ করতে চান না, তিনি তাই নবভারতের ইতিহাসে নূতন পৃষ্ঠা যোজনার জন্য এত ব্যগ্র।

বহু দেশ পর্যটন করেছেন রমেশচন্দ্র। ভারতের বাইরে তিনি গিয়েছেন অনেক স্থানে। কিন্তু সেখানেই তাঁর পর্যটন শেষ হয় নি। তিনি স্বদেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পীঠস্থানেও ভ্রমণ করেছেন। সর্বতীর্থসার ব'লে তিনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন এই ভারততীর্থকে, তাই তিনি ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে এগিয়ে চলেছেন—লখনউ দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন পুনা নাসিক কটক ভুবনেশ্বর সাঁচী উদয়গিরি মাদ্রাজ তাঞ্জোর মাদুরা ত্রিচিনোপলি কুমারিকা ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর বাঙ্গালোর কাশ্মীর এবং খাইবার পাস। ভারতের সব জায়গা দেখে বেড়িয়েছেন তিনি, ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছেন, আর গিয়েছেন পুনার নিকটবর্তী ভাজা-গুহায় ঐতিহাসিক গবেষণার উদ্দেশ্যে। এখানে বিস্তর ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে।

১৯২৮ সালেই ভারতের বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি। পুনরায় ১৯৫০ সালে যান ইটালির ফ্লোরেন্সে— ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে ইউনেস্কোর বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্যে। ১৯৫১ সালে যান ইস্তাম্বুলে—ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্ট-এর বাইশতম অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য, সেখানে তিনি ইণ্ডোলজি-শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালে ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ওরিয়েণ্টালিস্টস-এর প্রতিনিধিরূপে যান প্যারিসে,— ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফি অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য।

ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্টসের কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ওরিয়েণ্টালিস্টের সংগঠনের জন্যে উক্ত কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করেন, রমেশচন্দ্র তার সদস্য ছিলেন।

ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফি অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, 'সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব ম্যানকাইন্ড' নাম দিয়ে ছয় খণ্ডে যে গ্রন্থ প্রণয়নের ও প্রকাশের জন্য ইউনেস্কো পরিকল্পনা করেছেন, তার আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রমেশচন্দ্র এবং এর সম্পাদনা-সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁর উপর একটি কর্তব্যভার ন্যস্ত করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু গত যুদ্ধের সময় যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার যে উদ্বৃত্ত অর্থ এখন থাইল্যাণ্ডে জমা আছে, তার দ্বারা সম্প্রতি একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। এই ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যাঙ্ককে কয়েকটি বক্তৃতাদানের যে ব্যবস্থা হয়েছে, ভারত সরকার রমেশচন্দ্রকে সেই বক্তৃতা দিবার জন্য নির্বাচন করেছেন।

তার জীবনের কথা হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও কথা।* এর মধ্যে ঐতিহাসিক পুরুষদের কথাও আরম্ভ হল। তিনি বললেন, "ঐতিহাসিক পুরুষদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেন অশোক, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আমি অভিভূত হই। এরই প্রভাবে আমি আমার পুত্রের নাম রাখি অশোক।"

একটু থেমে বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন শিবাজি। নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় শিবাজি নেপোলিয়নের চেয়েও বড় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। নেপোলিয়ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু শিবাজি? শিবাজিকে নিজের শক্তির দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে নিতে হয়। মোগল সাম্রাজ্যের তখন কী প্রবল প্রতাপ, সামান্য একটি জায়গীরদারের ছেলে সেই মোগল-সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।"

বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন বুদ্ধ। তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বেশি করে মনে হয়। বিশ্বের প্রতি তাঁর যে দরদ, তার তুলনা নেই।"

ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতার কথা তিনি বলেছেন। এবার বললেন ভারতের দুর্বলতার কথা। আমাদের দেশের জাতিবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এ ছাড়া হিন্দুসমাজে নারীদের অধিকারও দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ। বললেন, "এই দুইটি বিষয়ে আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি, সেইসব প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ভারতের স্বর্ণযুগের যে ইতিহাস আমরা পাই, তাতে দেখা যায় সে সময়ের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এই ব্যবস্থা দুটি কখনো অনুমোদন করে নি। আসল কথা এই— এসব বৈষম্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঘোরতর বিরোধী। এর অবসান অচিরে আবশ্যক।"

কেবল দেশের কথা নয়, দশের কথাও চিন্তা করেছেন রমেশচন্দ্র।

তাঁর এই উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টি বেশির ভাগই ছিল ভারতের বাইরে প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জের দিকে, এরই মধ্যে তিনি নিজের ঘরের কথা ভুলে যান নি, ভুলে যান নি বাংলার কথা। তাই তিনি বাংলাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার কোনো ইতিহাস ছিল না, সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেছেন রমেশচন্দ্র।

নীচে নেমে এলাম। বিপিন পাল রোডে রাত্রি নেমেছে। সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই দেশপ্রিয় পার্ক। পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম বাস্-এর প্রতীক্ষায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

বাংলার ইতিহাস

Corporate Life in Ancient India

Early History of Bengal

Outline of Ancient Indian History & Civilization

Ancient Indian Colonies in the Far East, 3 Vols

Hindu Colonies in the Far East

Greater India

Ancient India

Inscriptions of Kambuja

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

যে গাছের শিকড় মাটির গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং মাটির রস টানবার উপযুক্ত শক্তি রাখে, সেই গাছই হয়ে ওঠে মহীরুহ। অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক গাছের খবর আমরা পাই। বটগাছ থেকে অজস্র ফল ঝরে পড়ে মাটিতে, সব ফলেই যদি গাছ জন্মাত তা হলে পৃথিবী বটের অরণ্যে ছেয়ে যেত। তা হলে বটগাছের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেত, বটের বটত্ব খর্ব হয়ে যেত। কিন্তু সব ফল থেকে অঙ্কুর গজায় না, সব অঙ্কুর বৃক্ষ হয়ে ওঠে না। মাটি থেকে রস টানবার উপযুক্ত বলিষ্ঠ মূল নিয়ে না নামলে মাটির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামের অতি সামান্য একটি বালক উত্তরজীবনে ঐতিহাসিক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন রূপে যে প্রখ্যাত হলেন, তার মূলে আছে একটি বলিষ্ঠ মূলের কাহিনী। যে-দেশে তার জন্ম সেই ভারতভূমির মাটির গভীরে তিনি তাঁর মননের শিকড় চালনা করতে এবং সার সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এইজন্যই তিনি আজ পরিপূর্ণ মহীরুহে পরিণত হতে পেরেছেন।

সমন্বয়ের ভূমি এই ভারতবর্ষ।—ভারতের এই আত্মার বাণীর সঙ্গে যিনি পরিচিত হতে পেরেছেন, সেই ঐতিহাসিকই সার্থক ঐতিহাসিক। কেবল তথ্যের ও সন-তারিখের স্তূপ রচনা করাই ঐতিহাসিকের কাজ নয়। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের আত্মার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছেন। ধর্ম-বিজয়ী অশোক ভারতের সর্বত্র গুহালেখ গিরিলেখ শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ ছড়িয়ে রেখে গেছেন। সেই লেখমালার পাঠোদ্ধার ক'রে যা জানা গেছে, সেই হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রঘোষ। দুই সহস্রাধিক বর্ষ গত হয়েছে,

অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তবুও ভারতের এই বাণীর বদল হয় নি। ঐতিহাসিকরূপে সুরেন্দ্রনাথ এই বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাই তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন সার্থক।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে সুরেন্দ্রনাথ কাজ করেছেন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। কয়েক-বছরের প্রবাসজীবন কাটিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন কিছুদিন হল। বালীগঞ্জ ফার্ন রোডে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, বাড়ির নাম রেখেছেন নিজের গ্রামের নাম অনুসারে —মাহিলাড়া। সে বাড়িতে এখন আছেন ভাড়াটে। নিজের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভাড়াবাড়িতে উঠতে হয়েছে। রসা রোডে।

৩০শে মার্চ ১৯৫৩ সোমবার। সন্ধ্যের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। বললেন, "এখানে আছি। বই-পত্তর সব আনতে পারি নি। জায়গা কম। অর্ধেক বই আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেখেছি।"

মাঝের একটা ঘরে আমরা ব'সে। দু পাশে দুটো দরজা— দুটো ঘর। দেখলাম, ছাত পর্যন্ত উঁচু কাঠের র‍্যাক বইতে বোঝাই। তবু অর্ধেক আনতে পারেন নি। সব বই নিয়ে এলে হয়তো নিজেদের চলাফেরার বা থাকারই জায়গা হবে না।

বললেন, "এখানে তবু তো এখন আছি কোনো রকমে। প্রথমে এসে যখন পৌঁছই, তখন এর চেয়েও একটা ছোট ঘরে উঠি। ভারি অসুবিধে হয়েছিল। কোনো রকমে ছিলাম। রান্নারই জায়গা ছিল না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমার জিজ্ঞাস্য কি কি শুনে বললেন, "বাংলার ১২৯৭ সনের ১৩ই শ্রাবণ, খ্রীস্টীয় ১৮৯০ সালের ২৯শে জুলাই বরিশাল জেলার মাহিলাড়ায় আমার জন্ম। বাল্যজীবন কাটে টাঙ্গাইলে। সেখানে আমার পিতা স্বর্গত মথুরানাথ সেন জমিদার স্টেটে

কাজ করতেন। সন্তোষের ইস্কুলে আমার প্রথম পাঠ আরম্ভ।* এখানে দু বছর পড়ি।"

তার পর ফিরে আসেন দেশে। মাহিলাড়ার কাছেই বাটাজোড় গ্রাম। এখানে অশ্বিনীকুমার দত্তের ইস্কুলে ভর্তি হন—বাটাজোড় হাই ইংলিশ স্কুলে। ১৯০৬ সালে এখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন তৃতীয় বিভাগে। ১৯০৮ সালে এফ.এ পাশ করেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে— এ পরীক্ষাও তিনি পাশ করেন তৃতীয় বিভাগে।

পর পর দুটো পরীক্ষাই তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। ছাত্রজীবনে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না এদিকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়াও অসুবিধে। তাই ছাত্রজীবনে ইস্তফা দিয়ে তিনি কাজ নিলেন— শিক্ষকতার কাজ। ব্রজমোহন স্কুলে মাস্টারি করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন ব্রজমোহন স্কুলে, কিছুদিন নদীয়ার শিকারপুরে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিন্তু শিক্ষকতা করেই জীবন কাটবে কি না, হয়তো এ সম্বন্ধে মনে সংশয় ছিল। কেননা, শিক্ষকতা করার মত উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত নন—তৃতীয় বিভাগে পাশকরা একজন এফ.এ মাত্র। এই জন্যে তিনি এই সময় প্লিডারশিপও পড়েন। বছর-তিন মাস্টারি করার পর তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন। প্লিডারশিপ পরীক্ষাও দেওয়া হয় না।

তিনি এলেন ঢাকায়। ১৯১১ সালের কথা। তিন বছর সে ছাত্র-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পুনরায় গ্রহণ করলেন সেই ছাত্রজীবনই। বললেন, "১৯১৩ সালে ইতিহাস অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করি, এবং ১৯১৫ সালে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করি—প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হন প্রথম।"

মাটি থেকে রস সংগ্রহের উপযুক্ত শক্তি ছিল না যে শিকড়ের, তিন বছর ছাত্রজীবন থেকে দূরে থেকে সম্ভবত সেই শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাই নতুন উদ্যমে আরম্ভ হল তাঁর পাঠ। তাই তৃতীয়শ্রেণীর ছাত্র উন্নীত হলেন প্রথমশ্রেণীতে। যাঁর জীবনে কোনো সম্ভাবনার লক্ষণমাত্র ছিল না, সেই জীবন পুষ্পিত হয়ে উঠল বর্ণময় সম্ভাবনাতে। কিন্তু মনে উৎসাহ এলেও পথ তখনো সম্ভবত প্রস্তুত হয় নি। এম.এ পাশ করেই তিনি তাই জীবনে অগ্রগমনের পথে পা বাড়াতে পারলেন না। নতুন কাজের সন্ধান করলেন। অথচ মনের মত কাজ সহজে সংগ্রহ হয় না। তিনি গতানুগতিক একটি কাজ গ্রহণ করলেন। বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী তখন ঢাকায় থাকতেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গার্ডিয়ান টিউটার হলেন।

বছরখানেক এই গৃহশিক্ষকতা করার পর তাঁর অগ্রগতির পথ যেন উন্মুক্ত হল। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে জব্বলপুর গভর্নমেণ্ট কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে তিনি সেখানে গেলেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় জব্বলপুরে ছিলেন। পর বছর অক্টোবর মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদ পেয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লেকচারার থাকার পর ১৯৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বললেন, "এর পর যাই দিল্লীতে। ন্যাশনাল আর্কাইব্স্এ (ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে)। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এখানে থাকি। এই বছরই পাঁচ মাসের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হই। ন্যাশনাল আর্কাইব্স থেকে রিটায়ার ক'রে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হই। ১৯৫০এর এপ্রিলে আবার রেক্টর হই

জুলাইতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হই। ১৯৫৩র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলার ছিলাম। সে কাজ ত্যাগ করে বহুদিন বাদে ফিরে এসেছি বাংলাদেশে।"

স্বল্পভাষী লাজুক-প্রকৃতির মানুষ সুরেন্দ্রনাথ। নিজের কথা বলতে তিনি যেন সংকুচিত ও কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগলেন। বললেন, "আমার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার এক বন্ধুর নাম বলতে পারি। তিনি আমার যাবতীয় খুঁটিনাটি জানেন।"

বললাম, "যার কথা বলেছেন তাকে আমি চিনি, তাঁর কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি।"

কেবল কর্মজীবনের কথা বললেন এতক্ষণ। তাঁর জীবনের ইতিহাস-প্রবণতা ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ ক'রে বললেন, "জব্বলপুর থাকা-কালে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করি। তারপর মহারাষ্ট্র ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। এই গবেষণার ফলে একটা থিসিস লিখি পেশোয়াদের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে। এই থিসিসের উপরই ১৯১৭ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার থাকা কালে ১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রীয়দের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার ফলে পি.এইচ-ডি ডিগ্রি পাই।"

ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করায় ব্রত হয়েই তিনি জীবনের ধারার সন্ধান পেয়েছেন। এই ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বলেই আজ তিনি বরেণ্য ও বরণীয় হয়ে উঠেছেন। ভারতের মাটির অভ্যন্তরে নিজের জীবনের মূল চালনা করা সম্ভবত একেই বলে। তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে কেউই তাঁর কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে নি; তিনি নিজেও হয়তো নিজের উপর কোনো ভরসাই রাখতে পারেন নি। তাই জীবনে যদি কোনো ধারা পাওয়া যায় তারই চেষ্টায় তিনি স্কলারশিপ

পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু সে পথ তাঁর পথ নয়। তাঁর পথ ইতিহাসের পথ। কিন্তু, এ পথ তাঁর পথ কেন?

বললেন, "ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার টান ছিল। তখন আমার বয়স আট। আমি রজনীকান্ত গুপ্তের আর্যকীর্তি পড়ে মুগ্ধ হই। এই কীর্তিকাহিনী আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। এ-বিষয়ে আরো সম্যকভাবে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হয়। এর পর আর-একটা বই পড়ি— বাংলায় অনূদিত টডের রাজস্থান। সেই থেকে ইতিহাসের দিকে ঝোঁক ছিল।"

বাল্যকালের এই ঝোঁক ছাত্রজীবনের নানারূপ পাঠ্যপুস্তকের চাপে হয়তো সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়ে থাকবে। ইতিহাস হয়তো গণিতের দ্বারা পীড়িত হয়ে থাকবে। তাই হয়তো এনট্রান্সে এবং এফ.এ.-তে তাঁর পরীক্ষার ফল তাঁর এবং তাঁর পরিজনদের পক্ষে উৎসাহজনক হয় নি।

অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, "ব্রজমোহন কলেজে যখন পড়ি, তখন অশ্বিনীবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এফ.এ. পাশ করার পর আমার পড়াশুনা যখন বন্ধ ছিল, তখন অশ্বিনীবাবু আমাকে উৎসাহ দেন ও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখতে বলেন।"

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব তা হলে নিশ্চয়ই আছে। তৃতীয় বিভাগে পাশ-করা একটি ছাত্রের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এই ছাত্রের প্রতি অশ্বিনীকুমারের আস্থা ছিল। এঁর দ্বারা যে কাজ হতে পারে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তা না হলে অতি সাধারণ একটি ছাত্রের উপর তাঁর এতটা দাবি হয় কী করে? কি ক'রে তাকে বলা যায়, একটি দূরদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী রচনা করতে?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব আমার জীবনে আছে। তিনিই আমার জীবনে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছেন। একটা কথা তো বোঝেন— আমি যে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. ও এনট্রান্স পাশ করি। তার পর আবার নতুন করে পড়াশুনা আরম্ভ করব, তার জন্যে দরকার ছিল কেবল উৎসাহের নয়, আত্মবিশ্বাসের। অশ্বিনীকুমার আমাকে এই বিশ্বাসটি দিয়েছেন।"

এই প্রসঙ্গে নাম করলেন আর একজনের— তিনি ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক র‍্যাম্স্‌বোথাম। অশ্বিনীকুমার ও র‍্যাম্স্‌বোথাম তাঁর জীবনে দুটি নক্ষত্র।

ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় তিনি বাল্যকালের ইতিহাস-প্রবণতায় নূতনভাবে উৎসাহ পান রজনীকান্ত গুহের কাছে। তার উপর রজনী-কান্তের মেগাস্থেনিসের ভারত-বিবরণ পাঠ ক'রে ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। আর একজন হচ্ছেন স্বনামধন্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়— ইনিও সুরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একটি সাধারণ জীবন অসাধারণতার পথে যাত্রা শুরু করে। সেই যাত্রা কখনো মন্থর কখনো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে চলল দিনের পর দিন।

বললেন, "ইতিহাসের উপর ঝোঁকের কথা বলেছি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই শিবাজীর উপর আমার আকর্ষণ। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত পড়েই এটা হয়েছে।

গৃহশিক্ষকতা করতে করতে জব্বলপুর কলেজে গিয়ে অধ্যাপক হবার পরই তাই তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেন মারাঠা ভাষা শিখতে এবং তাই তাঁর প্রথম গবেষণাই হয় মহারাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে এবং এই

গবেষণার দ্বারাই পি.-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। শিবাজী সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'শিবাজীর আইডিয়ালিজ্ম্ ও ইমাজিনেশন আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।"

কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি স্যর্ আশুতোষের উদ্দেশে। এঁরই চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে অধ্যয়ন ও গবেষণাদি কাযের বিশেষ সুবিধে পেয়েছেন। বললেন, "ইউনিভারসিটি লাইব্রেরিতে ইতিহাসের বই ছিল না। যখন আমার যে বই দরকার হত, তাঁকে জানানো মাত্র তিনি সেই বই লাইব্রেরিতে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন, তখনই তিনি পুনায় প্রফেসার লিময়েকে চিঠি লিখেছেন বই পাঠাবার জন্যে। তাঁর কাছ থেকে কিভাবে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি আশুতোষ-প্রয়াণের সময় মাসিক বসুমতীতে এক প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে বলেছি।"

ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা ইত্যাদি করতে একাধিক ভাষা জানা দরকার। এই জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছে। তিনি ইংরেজি বাংলা ও ভারতীয় আর দু-একটি ভাষা বাদে ফরাসি ও পর্তুগীজ জানেন। সংস্কৃতও কিছুটা জানেন।

বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি বহুপ্রচলিত ও বহুসমাদৃত। সুরেন্দ্রনাথের রচনার ভাষায় লালিত্য ও সরলতা, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশের প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ আছে, তা তাঁর জীবনেই প্রকাশ করেছেন, তাঁর রচনার মধ্যেও তাঁর জীবনের সেই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। পুনা ভারত-ইতিহাস-সংশোধকমণ্ডল, ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, অ্যাকলুইড সোসাইটি ইত্যাদির তিনি সদস্য,

ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন একবার। এ ছাড়া ইংলণ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটির ফেলো, ফ্রান্সের Ecole Francaise D.Extreme-Orientএর অনারারি সদস্য ও Institute Historique et Heraldiqueএর অনারারি করেস্পণ্ডিং মেম্বার।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে দিল্লী থেকে তিনি চলে এসেছেন। কর্মের জীবন শেষ হয়েছে, কিন্তু জীবনের কর্ম শেষ হয় নি। বললেন, "এখন প্রথম কাজ হচ্ছে—মাদ্রাজের সার্ উইলিয়ম মেয়ার-এর জন্যে প্রবন্ধ রচনা করা। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি কিছু দিন হল।"

তার পর আপাতত আছে আরও দুটি কাজ—হিস্টরি অব্ ইণ্ডিয়ার নবম ভলিউম লেখার ভার পড়েছে তাঁর উপর। "এটা হবে ভারত-ইতিহাসের period of transition সম্বন্ধে—১৭১৩ থেকে ১৭৭৮ সালের ইতিহাস।"

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—মহারাষ্ট্রীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধে। বাল্যে শিবাজীর প্রতি যে টান হয়, সেই আকর্ষণ এখন পর্যন্ত শ্লথ হয় নি নিশ্চয়। শিবাজীর দেশের কথা তাই এখনো তিনি ভোলেন নি, বললেন, "মহারাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনী সম্বন্ধে লিখবার ইচ্ছা আছে।"

দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইব্স্ আগে ছিল রেকর্ড রাখবার একটা গুদাম বিশেষ। এখানে নথিপত্র জমা করা হত, কিন্তু সেসব ব্যবহারের সুবিধা ছাত্ররা বিশেষ পেত না। সুরেন্দ্রনাথের হাতে এর ভার পড়ার পর তিনি এটিকে নতুন ভাবে গঠন করেন। তিনি একে স্টোরের স্তর থেকে ইন্স্টিটিউটের স্তরে উন্নীত করেন। বললেন, "ছেলেরা আগে এখানে ঢুকতে পারত না। এখন ওখান থেকে পাবলিকেশনস হয়। তার একটা পরিকল্পনা আমি রচনা করি।"

রুদ্ধদ্বারকে তিনি অবারিত করে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের ও চরিত্রের সঙ্গে এই কাজের সামঞ্জস্য যেন আছে। তিনি নিজেও এমনই অবারিত ও উদার।

সেই উদার-জীবনের সান্নিধ্য থেকে এবার বিদায় নিয়ে নেমে এলাম সঙ্কীর্ণ গলি পথে। সেখান থেকে প্রশস্ত রসা রোডে। রসা রোডে তখন রাত্রি নেমেছে। নীচে কালো পীচের পথ, উপরে কালো আকাশ। মাঝে মাঝে নক্ষত্রের মত জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো।

রচিত গ্রন্থাবলী

অশোক

হিন্দুগৌরবের শেষ অধ্যায়

প্রাচীন বাংলা পত্র-সংকলন

পেশোয়ারদিগের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি

পাখীর কথা

কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ। পর্তুগাল থেকে পাণ্ডুলিপি এনে সম্পাদন

Shiva Chatrapati.

Administrative System of the Mahrattas.

Military System of the Mahrattas.

Foreign Biographies of Shivaji.

Studies in Indian History.

Early Career of Kanhoji Angria and other papers.

Off the Main Track.

Indian Travels of Thevenot and Carery.

Sanskrit Documents in the National Archives of India.

Calender of Persian Correspondence, Vol. VII & IX.

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার
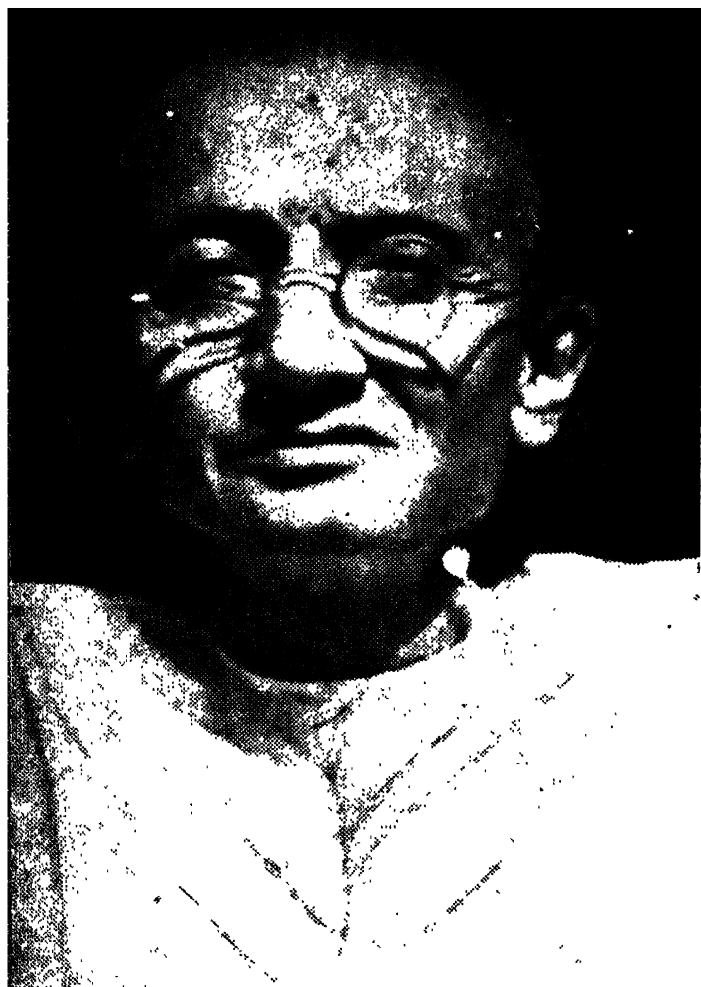
শীতের নিস্তব্ধ সকাল। এলাহাবাদের রাস্তা দিয়ে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। উত্তরভারতের শীতের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। আজ নতুন ক'রে তার সঙ্গে পরিচয় হল। এই অচেনা শীত সম্বন্ধে মনে মনে আতঙ্ক একটা ছিল। কিন্তু সে শীত গায়ে মেখে দেখা গেল, এতে কষ্ট তো নেইই, বরঞ্চ আরাম আছে। সেই আরাম ভোগ করতে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। কয়েক বছর হল চিত্রশিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এখানে আছেন। তাঁকে চাক্ষুষ দেখি নি, অনেক দিন আগের ছবি মাত্র দেখা আছে তাঁর। তিনি দেখতে কেমন, মানুষটা ঠিক কেমন— এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছি।

বাইকাবাগের চওড়া রাস্তায় সকালবেলার রোদ এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে দু পাশের গেটওলা বড় বড় বাড়িগুলো যেন আরামে রোদ পোয়াচ্ছে।

বাড়িটা পেলাম। ফটক দিয়ে ঢুকে গেলাম ভিতরে। পিছনের দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সোজা উঠে গিয়েই মুখোমুখি দাঁড়ালাম শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের। কার কাছে যেন শুনেছিলাম — প্রবাসী বাঙালিদের ঠাট একটু বেশি। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তার প্রমাণরূপেই যেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে।

অতি নিরীহ নম্র ও বিনয়ী, অতি সহজ আর অতি সরল। - আচারে তাঁর আচরণে, বেশে ও ভূষায়।

ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

• বাল্যকালে ছবি-আঁকা আরম্ভ করেছেন, এখনো তুলি চলেছে সমানে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারির জন্যে তাঁরা এসে প্রায়ই ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যান।

বললাম, "আপনার এখানে আসার পথে কাশীতে নেমেছিলাম। সেখানে ইউনিভার্সিটি-গ্যালারিতে আপনার অনেকগুলি ছবি দেখে এলাম। নতুন কিছু আঁকেন নি এর মধ্যে?"

নতুন ছবি এঁকেছেন। দুটি ছবি। মেলে ধরলেন মেঝের উপর। বাংলার মাটি ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেও ক্ষিতীন্দ্রনাথকে দেখে যেমন মনে হল বাংলার মাটির প্রলেপ দিয়ে তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, তাঁর ছবি দেখেও যেন সেই বাংলার মাটিরই স্বাদ পেলাম। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের দৃশ্যটি তিনি রঙে-রেখায় ধ'রে এনেছেন— পরিত্যক্ত নূপুর ও উত্তরীয়ের দিকে সাশ্রু চোখে চেয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া, এটা বিচ্ছেদের ও বেদনার একটা সজল আলেখ্য। তার পাশেই তিনি মেলে ধরলেন দ্বিতীয় ছবিটা, সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রথম মিলন। বর্ষার সজলকালো মেঘের কিনার দিয়ে যেমন রুপালি আলোর বিভা দেখা যায়—এও যেন অনেকটা তেমনি। বিরহী বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ আলেখ্যের পাশে সুভদ্রার সলজ্জ মিলনানন্দের দৃশ্য। মনোযোগ দিয়ে ছবি দুটো দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল, যিনি এই ছবি দুটো এঁকেছেন, তাঁর মনের মধ্যে এ দুটো আঁকা হয়ে আছে কী ভাবে। আমি অনেকক্ষণ ছবি দুটো দেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করলাম।

বললেন, "আমার বাল্যজীবন ধর্মকথা কীর্তন-গান ও কালোয়াতি গানের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কীর্তন-গানের সুললিত ভাষা এবং তার সুর-মাধুর্যে কীর্তনই আমাকে মুগ্ধ করে বেশি। কীর্তনের উপর আমার আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি আমাকে ছবি-আঁকার পথে নিয়ে যায়।

পদাবলীর ভাষা ও সুর শুনে কেবলই মনে হত, আহা, এই বিষয় যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তবে বোধ হয় আমার জীবনে একটা কাজ হত।"

৯ই পৌষ ১৩৫৯, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫২। শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী শুনছি'।

মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ, ১৮৯১ সালের ৩০শে জুলাই তাঁর জন্ম। পিতা কেদারনাথ সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র এক বৎসর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। "আমার পিতা একাধারে পিতা ও মাতা এই দুইটি স্নেহ দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেন।"

তাঁর পিতা অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ও সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি অতিথি-সেবায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কোনোদিন হয়তো অনেক রাত্রেই তাঁদের গৃহে অতিথি-সৎকারের জন্যে সংসারের সকলকে ব্যস্ত ক'রে তুলতেন। এই অতিথির মধ্যে বেশির ভাগই আসতেন সাধু-সন্ত। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে কীর্তন গান গাইতেন। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই কীর্তনের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠেন। সেই আসক্তি তাঁকে চিত্রাঙ্কনের দিকে চালিত ক'রে আজ এত দূরে এনে পৌছে দিয়েছে।

বললেন, "আমার বয়স যখন ষোল, তখন সাঁওতালপরগণার পাকুড় উচ্চইংরেজি বিদ্যালয় থেকে কলকাতার গবর্নমেণ্ট আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই।"

নিমতিতায় উচ্চইংরেজি বিদ্যালয় তখন ছিল না; সেইজন্যে নিমতিতা থেকে মাইনর পাশ করে তিনি আসেন পাকুড়ে। পাকুড়ে দু-বছর পড়েন। "থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেই চিত্রাঙ্কন-শেখার জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। উপায় কী? কী ক'রে আর্টস্কুলে যাওয়া যায়? এ সময় লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে পিতা রাগ করবেন, কিন্তু পড়াও আর ভালো লাগে না।"

তিনি তাঁর পিতাকে নিজের মনোভাব জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই পত্রের উত্তরে তাঁর পিতা তাঁকে চিঠি লিখলেন বাড়ি আসার জন্যে। পিতার মনোভাবও ক্ষিতীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলেই তাঁর পিতা তাঁকে সাব-রেজিস্ট্রার ক'রে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সে স্বপ্ন চূর্ণ করে দিয়ে এক অসম্ভব প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, তিনি চিত্রাঙ্কন শিখবেন।

জীবনে সংকল্পের পথে বাধাও যেমন আসে, সেই সংকল্পের সহায়ও আসে তেমনি— কালো মেঘের কিনারে রুপালি রেখার মত। ক্ষিতীন্দ্রনাথের সহায় হয়ে দেখা দিলেন নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। থিয়েটারের উপর এঁর খুব ঝোঁক ছিল, তাই ইনি ভাবলেন যে, তাঁর গ্রামের এই ছেলেটি যদি আর্টস্কুলে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে আসে তা হলে তাঁর থিয়েটারের সিন্ আঁকার জন্যে বাইরে থেকে আর লোক ভাড়া ক'রে আনার ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

বললেন, "একে তিনি আমাদের আত্মীয়, তার উপর গ্রামের জমিদার, তাই বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। বাবা ছিলেন আবার অদৃষ্টবাদী। আমার জন্মপত্রিকায় নাকি লেখা ছিল যে, আমার লেখা-পড়া বিশেষ হবে না। তবে, এমন-একটা দিকে যাব যে, যার দরুন দেশ-বিদেশে নাম ছড়িয়ে পড়বে: যাই হোক, মহেন্দ্রনারায়ণ যে উদ্দেশ্যেই আমার সহায় হোন, এতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে আমি আর্টস্কুলে ভর্তি হলাম। তখন আমার বয়স ষোল বৎসর।"

সে সময় পার্সি ব্রাউন ছিলেন গবর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল। এখানে এক বছর পর পরীক্ষা দিতে হল, পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। পরীক্ষার ভয়ে পাকুড় ছেড়ে এখানে এলেন, কিন্তু দেখলেন এখানেও পরীক্ষার দায় আছে। কিভাবে পরীক্ষার হাত থেকে উদ্ধার

পাওয়া যায়, এই হল তাঁর চিন্তা। তিনি শুনেছিলেন যে, ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে পরীক্ষার কোনো ঝামেলা নেই। সেখানে ভালো ক'রে শিখতে তিন-চার বছর সময় লাগে। মনে মনে ঠিক করলেন, ঐ ক্লাসেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু উপায় কী? কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়? কিভাবে দু-এক মাসের মধ্যে যাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাসে ?

বললেন, "মনে মনে স্থির করলাম শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত একখানা ছবি কপি ক'রে তাঁকে দেখাব। যদি তিনি আমার কাজ দেখে খুশি হন, তা হলেই সহজে আমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। অর্থাৎ নিদারুণ ভীতিপ্রদ এগজামিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।"

দশ-বারো দিন খেটে তিনি অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের মায়ামৃগবধ ছবিখানা কপি করলেন। কিন্তু এর পর এল অন্য ভয়। তিনি পল্লীগ্রামের ছেলে, সর্বদাই ভয়ে আর শঙ্কায় থাকেন। এই ছবি নিয়ে কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হবেন— এইটেই হল নতুন সংকট। কিন্তু, যেমন ক'রেই হোক, তাঁকে এ-কাজ করতেই হবে। অবনীন্দ্রনাথ যে ঘরে বসতেন, একদিন টিফিনের ছুটির সময় তিনি সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার কাছে একজন যে দাঁড়িয়ে আছে তা জানাবার জন্যে বালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ জুতোর শব্দ করতে লাগলেন।

এই শব্দে আকৃষ্ট হলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং ঘরে প্রবেশাধিকার পেলেন ক্ষিতীন্দ্র।

কেবল শব্দে নয়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র দেখেও আকৃষ্ট হলেন অবনীন্দ্র ; এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকার পেলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট ক্লাসে।

কিন্তু সব কাজেই বাধা আছে। জীবনে সহজ-সিদ্ধি জিনিসটা সুখের হতে পারে কিন্তু তার স্থায়িত্ব নেই। তার মূল্য তাই বেশি না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাধা পেতে পেতে এগিয়ে চললেন।

অবনীন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রকে নিজের ক্লাসে ভর্তি করে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু বাধা হয়ে এল স্কুলের নিয়মতন্ত্র। আর্টস্কুলের নিয়ম তখন ছিল যে, সেকেণ্ড ইয়ার থেকে পাশ না ক'রে কেউ অন্য বিভাগে যেতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে হেডমাস্টার হরিনারায়ণ বসু মহাশয় কিছু করতে না পারায়, অগত্যা অবনীন্দ্রনাথ সরাসরি প্রিন্সিপাল পার্সি ব্রাউনকে এ বিষয় বললেন। এতে কাজ হল। অন্য বিভাগে যাবার অনুমতি পেলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

বললেন, "অনুমতি পেলাম। আমার মন যে দিকে পড়ে আছে, বাল্যের কীর্তন গান আমার কানের মধ্যে যে আগ্রহ সঞ্চার করেছে, সেই পথে এবার পা বাড়িয়েছি। হেডমাস্টার হরিনারায়ণবাবু বললেন, বাপু, ও ক্লাসে গিয়ে কি হবে? তোমার ইহকাল পরকাল দুইই যাবে। কারণ, ওখানে কিছু শেখানো হয় না। ওদের অঙ্কন-পদ্ধতি কেমন, জান? একটা কুকুর এঁকে তাঁর নীচে লিখতে হয়— ঘোড়া। কারণ ওদের ছবি দেখে কুকুর কি ঘোড়া বুঝবার উপায় নেই। আর কি জান, ও-আর্ট শিখলে ভাত মিলবে না।"

সব শুনেও বালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ অটল। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "যাই হোক। আমি তো গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে হাজির হলাম, এবং খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর উপদেশমত কাজ করতে আরম্ভ করলাম।"

বছর দুই-তিন কেটে গেছে। অবনীন্দ্র-শিষ্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কন করে চলেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছবি এঁকেছেন তিনি। কিন্তু সর্বসমক্ষে সে ছবি হাজির করা হয় নি।

বললেন, "সালটা বোধ হয় ১৯১১, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলণ্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এসেছিলেন, সেই বছর আমি আমার অঙ্কিত ছবি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের এগজিবিশনে দিলাম।"

যেদিন প্রদর্শনী খুলবে তার আগের দিন অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, বিকেলের দিকে গিয়ে তাঁরা দেখে আসবেন কি-ভাবে প্রদর্শনী সাজানো হল। তাঁরা গেলেন। গিয়ে তাঁরা ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখলেন। "আমার সাতখানা ছবি যে জায়গায় ছিল শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ সেখানে এসে বললেন, এ জায়গাটা একটু অন্ধকার, আমি বলি আমার ছবিগুলি যেখানে আছে সেখানে তোমারগুলি দাও, আর তোমার ছবির জায়গায় আমারগুলি।"

গুরুর মহত্ত্বে মোহিত হলেন শিষ্য, কিন্তু গুরুর কথা অনুযায়ী কাজ করতে স্বীকৃত হলেন না। যেখানে ছিল তাঁর ছবি, সে-ছবি সেখানেই রইল।

তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড়লাট। তিনি এগজিবিশনের উদ্বোধন করলেন। "আমার ভাগ্যবশত লেডি হার্ডিঞ্জ আমার আঁকা একখানা ছবি কিনলেন। ছবিটি হচ্ছে পর্বতকন্যা পার্বতী। ছবিখানি কিনে তিনি একবার আর্টিস্টকে দেখতে চাইলেন।"

লেডি হার্ডিঞ্জের এই কথা শুনে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, আর্টিস্ট অত্যন্ত ছেলেমানুষ, সে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলে থাকে, তাকে এখন এখানে নিয়ে আসার অসুবিধে আছে। কিন্তু ইংরেজ রমণী ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। সুতরাং এগজিবিশনের একজন কর্মীকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে গাড়ি রওনা হল।

হ্যারিসন রোডের হোটেলের সামনে হঠাৎ এসে দাঁড়াল লাটের গাড়ি। তরুণ বয়সের গ্রাম্যবালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ হঠাৎ এই গাড়ির আবির্ভাবে চমকিত হলেন, পুলকিত হবার অবকাশ সম্ভবত পেলেন না।

বললেন, "আমি পার্ক স্ট্রীটের এগজিবিশনে এসে হাজির হলাম।

লেডি হার্ডিঞ্জ আমার মাথায় হাত দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। পরদিন সকালের কাগজে দেখি আমার নামে বড় বড় হরফে খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছে। আর যায় কোথায়, বাকি ছয়খানা ছবি সেইদিনই বিক্রি হয়ে গেল।"

পর বৎসরের এগজিবিশনে লেডি হার্ডিঞ্জ আবার আসেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের আঁকা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা ছবিখানা ক্রয় করে নিয়ে যান। এর পর তাঁর তিন-চারখানা ছবি কেনেন লর্ড কারমাইকেল। লর্ড রোনাল্ডস্ত্রে পাঁচ বছর বাংলার লাট ছিলেন, এই পাঁচ বছরে তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের কুড়ি-বাইশ খানা ছবি কিনে নিয়ে গেছেন। বললেন, "লর্ড রোনাল্ডস্তে শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছবি খুব পছন্দ করতেন। আমিও এই রকমের ছবি আঁকতাম বেশি। তাই তিনি আমারই ছবি নিয়েছেন অনেকগুলি। তিনি আমাকে বৈষ্ণব আর্টিস্ট ব'লে ডাকতেন ও খুব স্নেহ করতেন। এর পর ইতালীর মুসোলিনীর কন্যা এগজিবিশনে এসে আমার চারখানা ছবি কিনে নিয়ে যান। আমার আরও অনেক ছবি বিদেশে চলে গেছে, তার সংখ্যা কত সে হিসেব ঠিক জানা নেই।"

তিনি যখন আর্টস্কুলের ছাত্র তখন বিলেতের রয়াল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রদেনস্টাইন কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে এসে অবনীন্দ্রনাথকে বলেন যে, তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের পাঁচ-ছয় খানা স্কেচ করতে চান—এজন্যে বালকটিকে রোজ দু-ঘণ্টা করে সিটিং দিতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হন এবং বলেন যে, শুধু ক্ষিতীন্দ্রনাথ কেন, অন্য কোনো বালকের স্কেচ যদি তিনি নিতে চান তাতেও অসুবিধে হবে না। রদেনস্টাইন তার উত্তরে বলেন যে, অন্য কোনো বালকের স্কেচ নেবার তাঁর ইচ্ছে নেই, তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথেরই নিতে চান, কেননা এই চেহারার মধ্যে খাঁটি ভারতীয় ভাব বর্তমান আছে।

বললেন, "তিনি পাঁচ-ছয় দিনে আমার পাঁচ-ছয় খানা স্কেচ এঁকে নেন; এবং আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে আমার শ্রীরাধার অভিসার ছবিখানা কিনে নিয়ে যান।"

আর্টস্কুলের ছাত্রজীবন শেষ হল। ১১।১নং হ্যারিসন রোডের ভিকটোরিয়া হোটেলে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। এই হোটেলে তিনি সুদীর্ঘ ছাব্বিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এই হোটেলের মালিক কুঞ্জবিহারী দত্ত তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এই কারণে হোটেলটির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল খুব বেশি। এখানে ব'সে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন।

১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সালে লর্ড রোনাল্ডজে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টকে সমবায় ম্যানশনে ভালো ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে সেখানে স্কুল খোলেন। শ্রীনন্দলাল বসু ও শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রথম এখানে শিক্ষক হন। অল্প কিছুদিন পরেই নন্দবাবু চলে যান। ক্ষিতীন্দ্রনাথকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। বললেন, "এখানে আঠারো-উনিশ বছর প্রধানশিক্ষক-রূপে কাজ করি। বোধ হয় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত। নানা প্রকার আনন্দ ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে সুখে-দুঃখেই দিন কেটেছে।"

এখানে থাকাকালে অবনীন্দ্রনাথের সহৃদয়তায় অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন ও নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন-গান শেখার সুবিধে পেয়েছেন। বললেন, "অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সর্বদাই বলতেন, ছেলেদের দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত অঙ্কন শেখানোর জন্যেই যে তোমাকে এখানে বেতন দেওয়া হয়, তা মনে করো না; আমরা তোমার উন্নতি দেখতে চাই। তাঁর নির্দেশমত আমি রোজ সাড়ে তিনটার সময় সোসাইটি থেকে ছুটি পেতাম কীর্তন-গান শেখার জন্যে। তিনি আমার এই

অনুরাগের বিষয় জানতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার পদাবলী গান শুনতেন।"

সোসাইটিতে যখন তিনি কার্যরত তখন জাপানের চিত্র-সমালোচক ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছবির মধ্য থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ছবি দেখে খুব প্রশংসা করে যান এর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর গুরুকুল আশ্রমের শিল্প-শাখার জন্যে শিক্ষকরূপে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এর পরের বছর স্বামীজীর দেহান্ত হয়, তাই গুরুকুলে যাবার কথা চাপা পড়ে যায়।

একবার এক ঘণ্টার নোটিশে নেপালের রাজা সোসাইটিতে আসেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথ অর্ধেন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রনাথ বসু আসেন। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবির উপরে যে বই লিখেছেন তার মলাটে ক্ষিতীন্দ্রনাথের একটি আলোক-চিত্র আছে। সেই ছবি নেপালের রাজার দেখা ছিল, তাই তিনি এখানে এসে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে চিনতে পারেন। বললেন, "তিনি আমাকে মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতীর ছবি আঁকতে বলে গেলেন। তাঁর নির্দেশ মত ২৪।২৫ খানা ছবি তাঁকে এঁকে দিয়েছি।"

নেপালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি ভালো সংগ্রহ আছে, আর আছে বোম্বাইতে বি. এন. ট্রেজুয়ারিওয়ালা নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। আর কার কাছে কত ছবি আছে তা তিনি বলতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথ পাঁচ-ছয় খানা ও অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আট-দশ খানা ছবি নিয়েছেন বলে তাঁর মনে পড়ে। লাহোর জাদুশালায় অনেক ছবি ছিল, কলকাতার জাদুঘরেও সম্ভবত একখানা আছে, এলাহাবাদ জাদুঘরে আছে অনেকগুলি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে একখানা

আছে। বললেন, "বেশি ছবি রইল কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরা এখনো আমার ছবি কিনছেন। তাঁদের ইচ্ছে, আমার আঁকা অন্তত এক শ খানা ছবি রাখবেন।"

কলকাতার সোসাইটির কাজ ছাড়ার পর এক বছর বাড়িতে বসে ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। ১৯৪২ সালে শ্রীঅমরনাথ ঝা তাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। বললেন, "এখানে বেশ সুখেই কাটছে।"

তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে, তাঁর স্নেহ পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন; ধন্য হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের প্রীতি স্নেহ ও শিক্ষা পেয়ে। আজ এঁদের কথা কেবলই তাঁর মনে হয়। জীবনে যদি এঁদের না পেতেন তা হলে তাঁর জীবন কোন্ পথে গড়িয়ে যেত তা বলা শক্ত।

একটু থেমে বললেন, "একটা কথা। আজকাল ছবি আঁকার একটা পদ্ধতি বের হয়েছে দেখছি। এতে মনে হয় চিত্রবিদ্যার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। ইউরোপের অনুকরণ করে লাভ? আসলে অনুকরণ জিনিসটাই খারাপ। ইউরোপ কেবল প্রকৃতি নকল করে করে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই নতুন পথের সন্ধান করছে। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি তো কেবল প্রকৃতি নকল করেই ক্ষান্ত হয় না, এ পদ্ধতিতে কল্পনার আসর প্রকাণ্ড। তবে কেন আমরা ইউরোপের দেখাদেখি নিজেদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হব। জাপানি চিত্র ও চীনা চিত্রও আর আগের মত নেই, ওই একই কারণে। আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীদের এ কথা মনে রাখা দরকার। তুলি ঘষে যা আঁকা যাবে, তা-ই যদি আর্ট হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো সর্বনাশ।"

কথাটা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা দেখে অনেক তথাকথিত কবি উৎসাহিত হয়ে গদ্যপথে পা বাড়িয়ে কবি হবার চেষ্টা করেছিলেন, আমরা দেখেছি। পদ্যছন্দে হাত না পাকলে দুরূহতর গদ্যছন্দ রপ্ত যে হয় না

এ হুঁশ তাঁদের নেই। চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রে এই ধরনের গন্ধশিল্পীর আবির্ভাবও ঘটেছে। প্রকৃত শিল্পীকে তাই আক্ষেপ করে বলতে হয়—

ওরা তো বোঝে না! তুলি আর রং
কী কঠিন বশ করা,
আমাদের কাজ ওরা ভাবে মস্করা।

ঠিক এই আক্ষেপই যেন শুনলাম ক্ষিতীন্দ্রনাথের মুখে। শিল্পপ্রাণ তিনি, তাই শিল্পের বিনাশ-সম্ভাবনায় তিনি আতঙ্কিত।

সেই আতঙ্কের ছোঁয়াচ যেন লেগে গেল গায়ে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম বাইকাবাগের রাস্তায়। শীতের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রাস্তার ধার থেকে টাঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম ত্রিধারা উদ্দেশে— ত্রিবেণীসঙ্গমে।
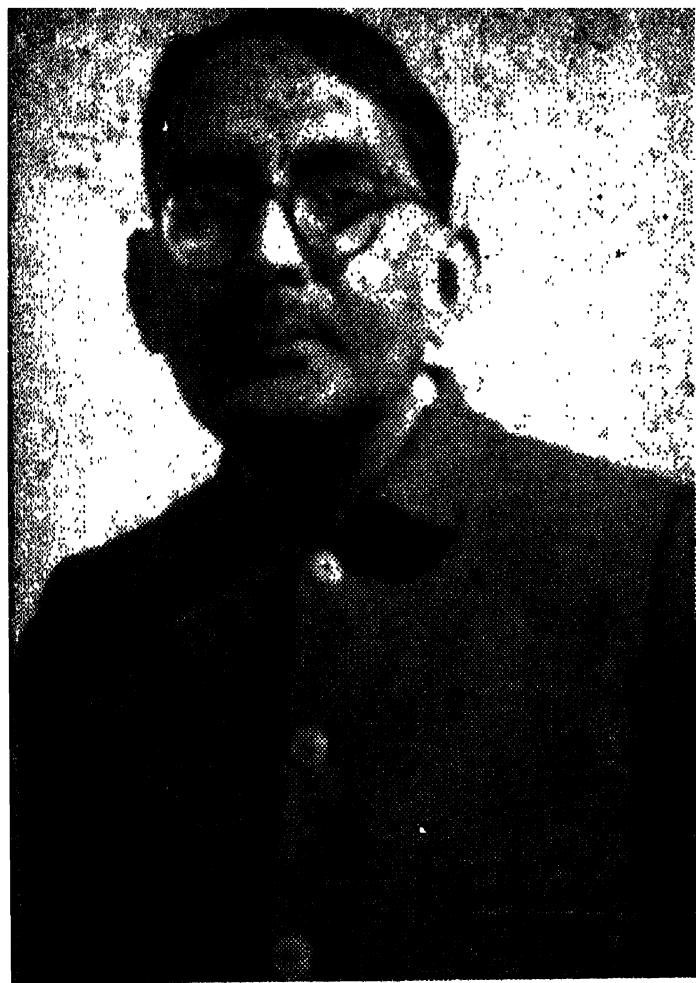
শ্রীনীলরতন ধর

মাটির মানুষ। মাটি নিয়ে গবেষণাই বৈজ্ঞানিক নীলরতন ধরের প্রধান কাজ। তিনি মাটিকে পরীক্ষা করে করে মাটি থেকে সংগ্রহ করেছেন সার। মাটির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার দরুন তিনি নিজেও হয়ে উঠেছেন মাটির মানুষ।

বর্তমানের এই লোহা-লক্কড় আর ইঁট-পাথরের সংসারে এই রকম দু-একজন মাটির মানুষ আছেন বলেই এখনো সংসারে কিছুটা সার আছে।

আসলে আমাদের সকলের ভিতরই মাটির প্রতি টান আছে, কিন্তু গায়ে মাটি মাখতে আমাদের আভিজাত্যে হয়তো বাধে। নীলরতন তাঁর গা থেকে আভিজাত্যের আবরণ ফেলে দিয়ে মাটি নিয়েই মশগুল আছেন। রসায়নের মধ্যে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছেন বলা যায়। তাই মাটিকেই করেছেন তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিনি ছাত্র। গুরুর কাছ থেকে তিনি কেবল রসায়নের মন্ত্রই গ্রহণ করেন নি, গুরুর কাছ থেকে সাদাসিধে জীবন-ধারণের এবং গভীরভাবে মননের মন্ত্রও গ্রহণ করেছেন। তাঁর এইরূপ অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রণালী দেখে তাঁকে বলা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন a sannyasi among scientists। বস্তুতপক্ষে তাঁকে এখন সন্ন্যাসীই যেন বলা যায়। পোশাকে-আশাকে কোনো চাকচিক্য নেই, সরল ও সহজ প্রকৃতি, এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, আত্মসচেতনতা নেই বিন্দুবিসর্গ। তিনি যে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ সংবাদ যেন তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। তাঁর নিরহংকার প্রকৃতি দেখলে এমনিই মনে হয়। তাঁর গৃহ সব সময় অবারিতদ্বার, যখন খুশি তাঁর সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হতে বাধা নেই এতটুকু।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৃতি ছাত্র তিনি। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ-গোছের। তাঁর গুরুদেব আচার্য রায়ের মত plain living ও high thinkingই তাঁর আদর্শ।

এলাহাবাদ শহরের এক প্রান্তে বেলী রোডের উপর ডক্টর নীলরতন ধরের নিজস্ব বাড়ি। শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত এই জায়গাটি। শীলাধর ইনস্টিটিউট অব সয়েল সায়েন্স ডক্টর ধরের বাড়ির সংলগ্ন। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের নূতন গৃহনির্মাণ হচ্ছে শীলাধর ইনস্টিটিউটের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে। উক্ত ভূমিখণ্ড দান করেছেন ডক্টর নীলরতন। ২২শে জানুয়ারি ১৯৫২ অ্যাকাডেমির নবগৃহের ভিত্তিস্থাপন করেছেন উত্তরপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। একাডেমির সম্পাদক ডক্টর রামকুমার শাকসেনা বার্ষিক কার্যবিবরণীতে নীলরতন ধরকে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন।

শীলাধর ইনস্টিটিউট নীলরতনের গবেষণাগার। তাঁর মৃতা পত্নীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। নীলরতন এই প্রতিষ্ঠানটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন ডিরেক্টর। উক্ত গবেষণাগারে নীলরতনের পরিচালনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত গবেষক-ছাত্র কৃষিবিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। গবেষকগণ সরকার থেকে বৃত্তি পান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গবেষকগণ ডি. ফিল ও ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন।

নীলরতন ধরের বয়স বর্তমানে একষট্টি বৎসর। এলাহাবাদ-প্রতাপগড় রেললাইনে গঙ্গানদীর উপর সেতু ডক্টর ধরের বাড়ি থেকে আড়াই মাইল দূরে। প্রতি রবিবার বিকালবেলা তিনি উক্ত সেতুকে বেড়াতে যান। তাঁর বাড়ি থেকে মুর সেণ্ট্রাল কলেজও এক মাইলের মত দূর। এই কলেজে প্রতিদিন সকালবেলা তিনি ক্লাশ নেন। সেখানেও তিনি পায়ে

হেঁটেই যাতায়াত করেন। বললেন, "আমি প্রতিদিন পাঁচ মাইল পথ হাঁটি।"

গ্রীষ্মকালে নীলরতন ধর কিছু দিনের জন্য মুশৌরি উতকামণ্ড বা অন্য কোনো শৈলাবাসে বেড়াতে যান। মুশৌরিতে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে বার্লু গঞ্জে। পিতার নাম অনুসারে এই বাড়ির নাম দিয়েছেন 'প্রসন্ন কুটির'।

খ্রীস্টীয় ১৮৯২ সনের ২রা জানুয়ারি, ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে পৌষ যশোহর শহরে নীলরতনের জন্ম হয়। বললেন, "আমাদের বাড়ি যশোহর জেলার ঘোলখাদা গ্রামে। যশোহর শহরেই বরাবর আমাদের বাস ছিল। আমার পিতার নাম স্বর্গত প্রসন্নকুমার ধর। তিনি যশোহরে উকিল ছিলেন। ১৯৩০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন ছিল ৩৮ বৎসর। আমরা ছয় ভাই ও তিন বোন।"

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা যশোহর শহরেই সম্পন্ন হয়। ১৯০৭ সালে যশোহর জেলাস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের পনর টাকা বৃত্তি পান। তার পর তিনি কলকাতায় রিপন কলেজে প্রবেশ করেন। রিপন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করে বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন ও কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। এর পর বি. এস-সি ও এম. এস-সি পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এস-সি অধ্যয়নকালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন নীলরতনের সতীর্থ ছিলেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, স্যর্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ঐ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করতেন। এঁরা নীলরতনের দুই

ক্লাস নীচে পড়তেন। এঁরা সকলে একসঙ্গে হিন্দু হস্টেলে থাকতেন। তখন তাঁদের মধ্যে সহৃদয়তা জন্মে। সে সম্পর্ক এখনো অটুট আছে।

১৯১১ সালে নীলরতন প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে অনার্স সহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও মাসিক বত্রিশ টাকা বৃত্তি পান। ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। পদার্থ রসায়নে (Physical Chemistry) তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সে বছর এম. এ. ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় নীলরতন দশটি স্বর্ণপদক ও পাঁচ শত টাকা নগদ পুরস্কার পান। এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভের পরও ডক্টর ধর দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা করেন। শেষ চার বৎসর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বাসায় থাকতেন।

১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ওই বছর থেকেই তিনি কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এস-সি., এম. এস-সি., পি. এইচ-ডি., ডি. এস-সি. এবং পি. আর. এস. পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষক হন।

১৯১৪ সালে তিনি নয় শত টাকার গ্রীফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ, ইলিয়ট প্রাইজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পদক লাভ করেন।

১৯১৫ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পেয়ে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে চার বৎসর অধ্যয়ন করতে যান।

১৯১৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ রসায়নে নীলরতন ডি. এস-সি. উপাধি পান।

প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিদেশীকে পদার্থ রসায়নে স্টেট ডক্টর অব্ সায়ান্স উপাধি সচরাচর দেন না। নীলরতন ১৯১৯ সালে উক্ত উপাধি লাভ করে ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করেন।

১৯১৯ সালে ডক্টর ধর লণ্ডনের এফ. আর. আই. সি. হন। তিনি লণ্ডনের কেমিকাল সোসাইটির ফেলো। ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়ান্স, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স এবং ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটির গোড়াপত্তন থেকেই নীলরতন উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ফেলো।

নীলরতনই প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় রাসায়নিক, যিনি লণ্ডনের বোর্ড অব এডুকেশনের বিশেষ সুপারিশে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস পান। ১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি এই পদ লাভ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে বাংলা দেশেই প্রেসিডেন্সি বা অন্য কোনো কলেজে কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে পাঠান হল এলাহাবাদে।

১৯১৯এর জুলাই মাসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মুর সেণ্ট্রাল কলেজে পদার্থ রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর থেকে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও পদার্থ রসায়নশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক।

গত কুড়ি বৎসর যাবৎ নীলরতন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করছেন। প্রায় চার বৎসর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব্ দি ফ্যাকাল্টি অব সায়ান্স ছিলেন।

বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যরূপে কাজ করেছেন নীলরতন।

তিনি ১৯৩৫-৩৭ সালে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সের সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে উত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উক্ত অ্যাকাডেমি থেকে স্বর্ণপদক পান।

তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (১৯৩৮-৩৯), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৩৯-৪৪), ডিরেক্টর (১৯৪৪), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৪৪-৪৬) হিসাবেও কাজ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ

থেকে অবসর গ্রহণ করে আবার তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও লণ্ডন প্যারিস এডিনবার্গ কেম্ব্রিজ আপসালা জুরিক ও অয়াজেনিনজেন (হলাণ্ড) প্রভৃতি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হয়ে রসায়ন ও কৃষিবিষয়ক তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। ১৯২৬ ১৯৩১ ১৯৩৭ ও ১৯৫১ এই পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন। এই কাজের আর শেষ নেই যেন, তাই তিনি আবার চলেছেন ইউরোপ অভিমুখে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালি তিনি। মোট সাতবার তাঁকে ইউরোপ যেতে হয়েছে ।

বিজ্ঞানের প্রতি প্রবণতার হেতু সম্পর্কে ডক্টর ধর বলেন, বাল্যকালে তিনি গবেষণামূলক জিনিসই পড়তে ভালবাসতেন। রিপন কলেজে পড়বার সময়ই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বললেন, "বৈজ্ঞানিকের চাই বুদ্ধি সততা পরিশ্রম ও কর্মশক্তি। ছাত্রজীবনে আমি এই গুণাবলীর অধিকারী হবার জন্যে চেষ্টা করেছি। আর কিছু না।"

একটু থেমে আবার বললেন, "বিজ্ঞানের সেবা, মানুষের উপকার করা ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম।"

বাস্তবিকই নীলরতন বিজ্ঞানের প্রচার করেছেন খুবই। তাঁর ডি. ফিল. ও ডি. এস-সি. উপাধিধারী বহু গবেষকছাত্র আছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কাযে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

নীলরতন তাঁর অর্জিত বহু অর্থ শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

শীলাধর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ ফেলোশিপ সৃষ্টির জন্য প্রতি মাসে তাঁর মাহিনার সকল টাকা ও ফণ্ডের টাকা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

করেছেন। সাত বৎসর এই হারে দান করবেন। দানের অঙ্ক সাত বৎসর পরে এক লক্ষ টাকার উপর উঠবে। শীলাধর গবেষণাগারটি তাঁরই অর্থে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তিনি দান করেছেন। যথা— ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-অধ্যাপক পদের জন্য, চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স, যশোহরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ। এইসব প্রতিষ্ঠানে তাঁর মোট দানের পরিমাণ সামান্য নয়।

এই বদান্যতা ছাড়াও আত্মীয়স্বজনদের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। সে এক দীর্ঘ তালিকা।

ফটো-রসায়ন, কলয়েড-রসায়ন ও কৃষি-রসায়ন শাস্ত্রে নীলরতনকে একজন অথরিটি বলে গণ্য করা হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে ও সার্ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, ডক্টর নীলরতন ধরই ভারতবর্ষে ফিসিকো কেমিক্যাল গবেষণার প্রবর্তক। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের অনেক পূর্বেই ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ও ভারতীয় বিজ্ঞানকংগ্রেসের রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ১৯৩২-৩৪ ও ১৯২২ সালে।

খাদ্য কৃষি ও নাইট্রোজেন সম্পর্কে নীলরতন অনেক গবেষণা করেছেন। রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ দেবার জন্য যে আন্তর্জাতিক দক্ষ কমিটি আছে, নাইট্রোজেন সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কারগুলির প্রতি তার কতিপয় সদস্যের দৃষ্টি নাকি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে ডক্টর ধরও উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৮ সালে রোমে যে আন্তর্জাতিক

সার-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নীলরতন তার কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে তিনি বাঙ্গালোরের সায়ান্স ইনস্টিটিউটের গবর্নিং কাউন্সিলের সদস্য।

ভারতবাসীর খাদ্যের মান অত্যন্ত নিম্ন, এই সম্পর্কে নীলরতনের অভিমত হচ্ছে—"প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসরব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে পিষ্ট জর্জরিত ভারতবাসী আজ আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে হলে চাই শক্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য, অদম্য বীর্য। এর জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন আপামর দেশবাসীর জন্যে সুলভে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য ও আহার্যের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক এ ব্রিঁলা সাঁভেরা-র (১৭৫৫—১৮২৬) উক্তি স্মরণ ক'রে আমরাও বলিতে পারি—Tell me what you eat I will tell you what you are. The destiny of a people depends on its diet !"

আহার্যে কেবলমাত্র চাল ব্যবহার সম্পর্কে নীলরতন বলেন, "চালে আবশ্যকীয় অ্যামিনো থাকার দরুন চাল খেলে বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো বাড়তে পারে তবে দেহের পুষ্টি ও শক্তির জন্য গম খাওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্য অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খাওয়া প্রকৃষ্ট। ভারতবর্ষে কাশ্মীরীরা (নেহরু, সাপ্রু, কুঞ্জরু, কাটুজুবা সব কাশ্মীরী পণ্ডিত) সাধারণত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খেয়ে থাকেন। সেই রকম গান্ধীজীর দেশবাসীরা, অর্থাৎ গুজরাটীরা, অথবা তিলকের দেশবাসীরা, অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়রা, অর্ধেক গম এবং অর্ধেক চাল আহার করে থাকেন। হয়তো এই কারণেই বর্তমানে ভারতবর্ষে এঁরা কর্মজীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা আসাম উড়িষ্যা অন্ধ্র তামিলনাদ মালয়ালম প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরা কেবলমাত্র চাল খেয়ে থাকেন। গম ব্যবহারে এঁরা অনিচ্ছুক। যখন দেশে লোক-সংখ্যা কম ছিল, খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যেত এবং দেশ শস্যশ্যামলা ছিল,

তখন বাংলা ও আসামে মাছ ও দুধের প্রাচুর্য ছিল। তখন গম থেকে প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ না গ্রহণ করেও মাছ দুধ তরকারি থেকেই এইসব আবশ্যকীয় পদার্থ পাওয়া যেত। অন্ধ্র তামিলনাদ ও মালয়ালমের অব্রাহ্মণরা সমুদ্রজাত মাছ খেতেন, এবং এখনও খেয়ে থাকেন। অন্ধ্র ও তামিলনাদের ব্রাহ্মণরা ঘি দুধ দৈ এবং ডাল প্রচুর পরিমাণে খেতেন এবং সেইজন্য চাল খেলেও তাঁদের স্বাস্থ্যহানি হত না। আজকাল সকল খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রায় চারগুণ, অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুধ দৈ ঘি ছানা ইত্যাদি খাওয়াই অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য এখন খাদ্যসমস্যাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এবং আমূল খাদ্যসংস্কারে যত্নবান হতে হবে। মুখরোচক বা পুরুষানুক্রমে এতদিন যা খাওয়া হয়েছে, তা খেলেই চলবে না। বাঙালি আসামী ও অন্যান্য যাঁরা এতদিন ভাত খেয়েই বেঁচেছেন, তাঁদের গুজরাটী মারাঠী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খেতে হবে।"

খাদ্য কৃষি ও নাইট্রোজেন — এই বিষয়গুলি নিয়েই তাঁর গবেষণা। তাঁর কৃষি ও নাইট্রোজেন সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি বিদেশে খুব সমাদৃত হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে এই গবেষণায় তিনি রত আছেন। তাঁর মতে ট্র্যাক্টর দ্বারা কর্ষণের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ইউরোপে এইজন্যে এখন ট্র্যাক্টরের ব্যবহার কমে যাচ্ছে।

১৯৩৭ সালে নীলরতন আন্তর্জাতিক কৃষি-কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন।

পাটনা কলকাতা আগ্রা নাগপুর লখনউ আলিগড় মহীশূর মাদ্রাজ বোম্বাই হায়দরাবাদ লাহোর কাশী ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বিশেষ লেকচারার-রূপে বক্তৃতা দিয়েছেন।

তাঁর জীবন কেবল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে জড়িত নয়; তাই তিনি নিজেকে কেবল গবেষণাগারের কৃত্রিম আলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর

জীবন মাটি দিয়ে ও মানুষ দিয়ে মাখা। তাই মাটির প্রতি তাঁর টান এবং মানুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। মানুষের দুঃখে তাই তিনি দুঃখিত। এইজন্যই তিনি অকৃপণ হাতে তাঁর অর্জিত অর্থ দান করতে পেরেছেন। এবং এইজন্যই বৈজ্ঞানিক নীলরতনকে আখ্যা দেওয়া যায় মাটির মানুষ বলে।

রচিত গ্রন্থাবলী

আমাদের খাদ্য

Chemical Action of Light

New conception of Biochemistry

Influence of light on Biochemical Processes

শ্রীমেঘনাদ সাহা

নীরবে মহাযজ্ঞ চলেছে। জ্ঞানের যেমন শেষ নেই, বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষারও তেমনি শেষ নেই। পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান এখন গ্রহান্তরে যাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। চাঁদকে ধরে এনে দেবার কথাটা এর আগে ছিল অলীক কল্পনা মাত্র; কল্পনার হাত থেকে সে-কথাটা এখন কেড়ে নিয়েছে বিজ্ঞান। সে বলছে, 'চাঁদকে ধরে এনে কাজ কি, এবার চল, দল বেঁধে চাঁদের দেশে যাই।' আমাদের মত বামনদের আর উদ্বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ বলে সংকোচে সংকুচিতও আর হতে হবে না। আমরা ছিলাম লিলিপুট, এবার হব বোধ হয় ব্রবডিংন্যাগ। কল্পনা আর কল্পনার রাজ্যেই বাঁধা থাকবে না, বিজ্ঞান তাকে টেনে নেবে নিজের জিম্মায়। হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরব আমরা। বিজ্ঞানের ইচ্ছেটা এই রকমই লম্বা।

কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজের সুবৃহৎ দালানের নিভৃত গবেষণা-কক্ষে বসে সাধকেরা এইসবেরই ষড়যন্ত্র করছেন।

৭ই জানুয়ারি ১৯৫৩, ২৩ পৌষ ১৩৫৯। দুপুর। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান-কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। এত বড় বাড়ি, এরই অভ্যন্তরে কত রকমের গবেষণা চলেছে। কিন্তু এতটুকু সাড়া নেই, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত নেই। সাধনার ধারাই বুঝি এমনি. এমনি শব্দহীন স্তব্ধতা।

আগে বিজ্ঞান আমাদের বলেছে যে, অণুই ক্ষুদ্রতম; তার পর শুনলাম তার চেয়েও ক্ষুদ্র পরমাণুর নাম। আবার জানা গেছে, এই পরমাণুকেও নাকি ভাঙা যায়, ভেঙে ভেঙে হয় ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি। বিজ্ঞান গবেষণা করে চলেছে; আজ বিজ্ঞান বলেছে পরমাণুর অভ্যন্তরে আছে

একটি শাঁস, সেই শাঁসের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অণুর ক্ষুদে ক্ষুদে ভগ্নাংশরা। সূর্যের চারদিকে যেমন গ্রহ-নক্ষত্র পাক খাচ্ছে, অনেকটা সেইভাবে। পদার্থবিজ্ঞানের এটা নতুন উদ্ভাবনা। এর জন্যে বিজ্ঞান-কলেজে নতুন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।--নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

এই গবেষণাগারের পরিচালক হচ্ছেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। দোতলার ঘরে ছাত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন। টেবিলে স্তূপাকার বই। আমার সঙ্গে দেখা হবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাই তিনি এবার আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে তৈরি হলেন। পৃথিবী-জোড়া এঁর নাম, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে এঁর জন্যে সম্মানের আসন নির্ধারিত হয়ে আছে, আইনস্টাইনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বলেছেন, Dr. M. N. Saha has won an honoured name in the whole scientific world।

কিন্তু এত সহজ ও সাধারণ মানুষ ব'লে এঁকে ঠেকল যে, মনে হল নিজের জ্ঞান ও গরিমা সম্বন্ধে ইনি যেন পরম উদাসীন।

পূর্ববাংলায় এঁর বাড়ি। দেশের ভাষা এখনো তাঁর জিভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি তাঁর স্বদেশীয় ভাষায় নিজের জীবনকথা বলতে লাগলেন।

খ্রীস্টীয় ১৮৯৩ (বঙ্গাব্দ ১৩০০) ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্য ব্যবসা করতেন। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। বিরাট একটি সংসার-পালনের ভার ছিল তাঁর পিতার উপর, কিন্তু তাঁর আয় ছিল সামান্য। এই কারণে অনটনের মধ্যে মানুষ হতে হয়েছে মেঘনাদকে। শৈশবের লেখা-পড়া শিক্ষা করতে হয়েছে তাই খুবই অসুবিধের মধ্যে।

তাঁদের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো স্কুল ছিল না। সেইজন্যে তাঁদের গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দূরের শিমুলিয়া গ্রামের মধ্য-

ইংরেজি স্কুলে তাঁকে পাঠ করতে হয়। কিন্তু পিতার সংসারের অবস্থা এমন নয় যে অন্য কোথাও ছেলেকে খরচ দিয়ে রেখে পড়াতে পারেন। শিমুলিয়ায় গিয়ে মেঘনাথ একটি আশ্রয় পেলেন। ডাক্তার অনন্তকুমার দাস তাঁর বাড়িতে মেঘনাদকে বিনা-খরচে থাকার ও খাওয়ার সুযোগ দিলেন। এখান থেকে পড়াশুনা ক'রে মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষায় মেঘনাদ ঢাকা-বিভাগের মধ্যে প্রথম-স্থান অধিকার করলেন।

এর পর, ১৯০৫ সালে, ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। পর বৎসর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। মেঘনাদ তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতিবাদ সভায় যোগদানের অভিযোগে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের পাইকারি হারে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা আরম্ভ হল। তিনি গিয়ে ভর্তি হলেন ঢাকার জুবিলি স্কুলে। এখানে বিনা মাইনেয় পড়ার সুযোগ পেয়ে এবং তার সঙ্গে বৃত্তি লাভ করে তাঁর পড়াশুনা করার অনেকটা সুবিধে হল। এইসব সুবিধে না পেলে লেখাপড়ায় বাধা হত, কেননা, তাঁর পিতা তাঁকে কোনো খরচই দিতে পারতেন না। এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল-ক্লাসেও যোগ দেন। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, মিশনের পরীক্ষায় বি. এ ক্লাসের ছাত্রদেরও হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এতে নগদ একশত টাকা পুরস্কার পেলেন, এই টাকা পেয়ে তাঁর অনেক সাহায্য হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এনট্রান্স পাশ করেন—পূর্ববাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত এবং অঙ্কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন।

বললেন, "আমার স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে ইনি কলকাতায় বেথুন কলেজে যোগ দেন), সতীশচন্দ্র মুখার্জি, সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন ও অধ্যক্ষ মথুরমোহন চক্রবর্তীর নামই আজ বেশি করে মনে পড়ছে।"

স্কুল থেকে বেরিয়ে ঢাকা কলেজে আই. এস-সি পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু ফোর্থ সাবজেক্টের নম্বর বাদ দিলে তিনিই পান প্রথম স্থান। তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জার্মান ভাষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে এ ভাষা শেখাবেন, এমন কাউকে তিনি পান না; শেষের দিকে অবশ্য অধ্যাপক ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁকে কিছুদিন পড়ান। এই কারণে তিনি জার্মানে খুব কম নম্বর পান এবং এরই ফলে আই. এস-সিতে অন্যান্য বিষয় মিলিয়ে প্রথম হলেও তাঁকে তৃতীয় স্থান লাভ করতে হয়। বললেন, "ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ডবলিউ. জে. আর্চগোল্ড আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, ডক্টর ওয়াটসন পড়াতেন কেমিস্ট্রী।"

এর পর মেঘনাদ এলেন কলকাতায়। এখন থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স-সহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে তিনি বি. এস্-সি পাশ করেন। এখানে যাঁরা তাঁর অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে তিনি দ্বিতীয় হয়ে এম. এস্-সি পাশ করেন।

"আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রথমেই ডক্টর নীলরতন ধরের নাম মনে পড়ছে—ইনি আমার চেয়ে দু বছরের সিনিয়র ছিলেন। আর আমার সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ. জে. এন. মুখার্জি ও নিখিলরঞ্জন সেন।"

তাঁদের এই ব্যাচই প্রখ্যাত স্কলার হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে চার জনই বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন—মেঘনাদ সাহা (১৯৩৪), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৯৩৭), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৪) জে. এন. মুখার্জি (১৯৫১)।

তাঁর ছাত্রজীবনের কথা সাঙ্গ করে সেই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করলেন

বাঘা যতীনের কথা। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হল, এই সময় তিনি বিষম সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন। বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এই কথা পুলিশের কানে যায়, এই জন্যে তিনি ফাইনাল্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান না।

বললেন, "আমরা ১১০নং কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে তখন থাকি। বাঘা যতীন প্রায়ই সেখানে আসতেন। তাঁর পরনে সব সময় থাকত সাহেবী পোশাক। তিনি আমাকে সব সময় বলতেন বিজ্ঞান নিয়ে লেগে থাকতে, বিপ্লব-অন্দোলনে যোগ না দিতে। একদিনের কথা আজ মনে পড়ে। বাঘা যতীন আমাদের মেস থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর আহেরীটোলার আড্ডায় রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে পড়ার জন্যে সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটা বই। একজন পুলিশ-অফিসার (তার নাম কি-যেন হালদার) বাঘা যতীনকে অনুসরণ করেন। যতীন তা টের পান। আহেরীটোলায় গিয়ে যতীন তাঁকে 'গুলী' ক'রে গা-ঢাকা দেন। পুলিশ-অফিসার মারা যান না, তিনি যতীনের নাম বলে দেন। বাঘা যতীন পলাতক হয়ে উড়িষ্যায় যান। এদিকে আমরা পড়ি সংকটে। যে বইটা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে নাম লেখা ছিল— জ্ঞান ঘোষ। কে এই জ্ঞান ঘোষ, পুলিশ তা হদিশ করতে পারে না; কিন্তু এ-খবর শুনে আমরা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাই। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ঘোষ যে কে, পুলিশ তা বুঝতে পারে নি, তা না হলে আমাদেরও রেহাই ছিল না।"

একটু থেমে বললেন, "লোকে শের শার নাম করে, যতীন ভোজালি নিয়ে বাঘ মারতেন। তাঁর মামা ডক্টর হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সুরেশ সর্বাধিকারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কুষ্টিয়ায় এই মামার কাছে যতীন একবার গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঘের সঙ্গে যতীনের সাংঘাতিক লড়াই

হয়। বাঘের মস্ত থাবার দাগ ছিল যতীনের উরুতে। সেই থেকেই তার নাম হল বাঘা— বাঘা যতীন।"

এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল ব'লে ফাইনাল্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেলেন না মেঘনাদ। এতে জীবনে দেখা দিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। এমন সময় আহ্বান এল সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

যে-বিজ্ঞান-কলেজের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গবেষণাগারের আজ তিনি পরিচালক, সেই বিজ্ঞান-কলেজেই তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের হাতে-খড়ি। এম. এস্-সি পাশ করার পর বছর-তিন কেটে গিয়েছে, ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনে প্রবেশের তিনি পথ খুঁজছেন, এমন সময় সার্ আশুতোষ নবগঠিত বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগে তাঁকে লেকচারার হবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। এ হল ১৯১৮ সালের ঘটনা। এখানে এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি গবেষণাকার্যে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। পর বছরই তিনি ডি. এস্-সি ডিগ্রি লাভ করলেন এবং তার পর-বৎসর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। এই দুই সম্মান তিনি পান রিলেটিভিটি, প্রেশর অব লাইট (বা আলোর ভর) ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্যে। ১৯২০ সালেই তাঁর বিখ্যাত গবেষণা লোকচক্ষুগোচর হয় এবং তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। তাঁর এই গবেষণা 'থিয়োরি অব্ থারমাল আয়োনাইজেশন' ব'লে খ্যাত হয়েছে, তাপের প্রভাবেও কী-ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয় তাঁর এই গবেষণা সেই পদ্ধতি উদ্ঘাটন করে। তিনি বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করে দেন, তিনি দেখান তাঁর এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা তিনি সূর্যের ও নক্ষত্রসমূহের স্বাভাবিক গঠন সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে তাঁকে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার যেমন বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র,

মেঘনাদের এই আবিষ্কারও তেমনি বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র বলে গণ্য হয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কারটি এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, সাড়ে তিন শ বছর আগে, ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে, গ্যালেলিয়োর দূরবীন-আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর এই আবিষ্কারটি পৃথিবীর বড়-বড় দশটি আবিষ্কারের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

তাঁর ঐ আবিষ্কারটি কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, এটি তাঁর জীবন-আবিষ্কারেরই তুল্য হল। জীবনের সংশয় ও অনিশ্চয়তা এবার দূরীভূত হল। এবার তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর জীবনের নূতন দিগন্ত। সেই বছরই, ১৯২০ সালে, তিনি গেলেন বিলেতে। সেখানে গিয়ে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনলজিতে প্রফেসর এ. ফাউলারের ল্যাবরেটরিতে প্রায় দেড় বছর, তার পর বার্লিনে প্রফেসর নার্নস্টএর ল্যাবরেটরিতে কিছুদিন গবেষণা করেন। যে-পদ্ধতি তিনি কাগজে-কলমে আবিষ্কার করেছেন, ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার জন্যেই এই দুই ল্যাবরেটরিতে তিনি কাজ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন বাদেই, ১৯২৩ সালে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান আসে। এর পর একটানা পনর বছর তিনি এলাহাবাদেই অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদই হয়ে ওঠে তাঁর দেশ এবং তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

যখন তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক, সেই সময়ই, ১৯২৭ সালে, বিজ্ঞানে তাঁর দানের পুরস্কারস্বরূপ তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সম্মানিত পদ লাভ করেন—ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি, বস্টন অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস্ তাঁকে অনারারি ফেলো রূপে নির্বাচন করেন এবং ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন

তাঁকে সদস্যপদে বরণ করেন। ১৯২৭ সালেই তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইতালীয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। অ্যালেসান্দ্রা ভোল্টা— বৈদ্যুতিক আবিষ্কারে যাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে, যাঁর নাম থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি বোঝাতে ভোলটেজ কথা চালু হয়েছে— মেঘনাদ ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণে কোমোতে গিয়ে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন ভারতের প্রতিনিধিরূপে। এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ তিনি সে সময়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লিখেছেন। ১৯৪৪ সালে ভারত-সরকার ছয় জন বৈজ্ঞানিক দ্বারা গঠিত একটি শুভেচ্ছা-মিশন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করেন— মেঘনাদ সেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে একটি রিপোর্ট রচনা করেন, সে রিপোর্ট ভারত-সরকারের পুঁথিশালায় জমা আছে। তিনি সোভিয়েট সরকার কর্তৃকও ১৯৪৫ সালে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এবং ১৯৪৭ সালে নিউটনের ত্রিশতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

এলাহাবাদে তিনি স্কুল অব ফিজিক্স নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষাদানের ও গবেষণার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শিক্ষার মান এত উচ্চ ছিল, এবং গবেষণার রীতি এত উন্নত ধরনের ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান—রাজস্থান পাঞ্জাব মহীশূর ইত্যাদি—থেকে দলে দলে ছাত্র এসে এখানে ভর্তি হত। এখানকার অনেক ছাত্র এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন।

বললেন, "এখান থেকে যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক'জনের নাম হচ্ছে ডক্টর ডি. এস. কোঠারি, ডক্টর পি. কে. কিচলু, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর জি. আর. তোশনিওয়াল, ডক্টর ডবলিউ. এম. বৈদ্য, ডক্টর বি. এন. শ্রীবাস্তব— এরা সকলেই আজ বিশেষ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন।"

এলাহাবাদে দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেন। সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু, আচার্য নরেন্দ্র দেও, বিচারপতি সুলেমান, ইকবাল নারায়ণ, ডক্টর তারাচাঁদ ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর ঘটেছে, এবং এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর বাল্যকাল থেকে। ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা কিভাবে সামাজিক উন্নতি সাধিত হতে পারে, সেই চিন্তা তিনি করে আসছেন অনেক দিন থেকে। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি হন, সে সময় তাঁর অভিভাষণে এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই অভিভাষণে সুফল ফলে। ভারতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স গঠিত হয়। এই ইনস্টিটিউট বর্তমানে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির অনুরূপ একটি বৈজ্ঞানিক সভায় পরিণত হয়েছে। তিনি এই ইনস্টিটিউটের কর্মতালিকা এবং গঠনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে একজন এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি এই সায়েন্স ইনস্টিটিউটের একটি সভায় নিমন্ত্রণ করেন। "সেই দিনই তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম মিলিত হই। সে সময় আমি তাঁকে ভারতে শিল্প-প্রসারের ও জাতীয় পরিকল্পনার বিষয় বলি।"

এই বছরই তিনি বিজ্ঞান-কলেজের কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' নামে একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বের করেন। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, জনসাধারণের কাছে সেই কথা সহজ ও সরল ভাষায় বলাই এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এককালীন এক হাজার টাকা এই পত্রিকা প্রকাশের জন্যে দান করেন।

বললেন, "এতে আমি ও আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা ভারতের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়ের প্রস্তাব রূপে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। তার মধ্যে অনেক বিষয় ছিল, যেমন দামোদর-উপত্যকার সংস্কার, উড়িষ্যার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলও ভালোই হয়। বর্তমানে ভারতে অনেক উন্নয়ন-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়েছে।"

১৯৩৯ সালে এলাহাবাদ থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজে পদার্থবিদ্যার পালিত-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেন। ভারতের আণবিক গবেষণার উদ্যোগের মূলে ছিলেন অধ্যাপক সাহা। তাঁরই উৎসাহে এখানে ইনস্‌টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন গবেষণাগারে তরুণ গবেষকগণ তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করে চলেছেন।

বিজ্ঞানের সর্বদিকে তিনি সমান উৎসাহী। কি করলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সুবিধে হতে পারে, তার জন্যে তিনি সব সময় সচেষ্ট এবং সর্বদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আছেই। বিজ্ঞান-কলেজে বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য তিনি সর্বদা যত্নবান।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য। এখানে সদস্য হিসাবে তিনি শিক্ষকদের ও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্মীদের সুখসুবিধা-বিধানের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন। বিজ্ঞানের সাধনা নিয়ে আছেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে যে রাখেন নি, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এইটেই প্রমাণিত হয় সুস্পষ্টভাবে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন নিযুক্ত হয়, মেঘনাদ ছিলেন সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য। এর ফলে তাঁর জীবনে

একটি অপূর্ব সুযোগ দেখা দেয়। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা চাক্ষুষ দেখে আসবার সুযোগ পান।

১৯২৭ সাল থেকে মেঘনাদ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের আজীবন সদস্য। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্গঠনের জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট থেকে এর প্রসারের জন্যে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। এখন এই অ্যাসোসিয়েশন নিজের জন্যে বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে কাজ করে চলেছে। এবং এর পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়েছিল মেঘনাদের আশৈশব সহচর ও বন্ধু ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের উপর।

বলছিলাম, বিজ্ঞানের সাধনা নিয়েই তিনি মগ্ন, তবু মানুষের কথা তিনি ভুলে থাকেন না। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাঁর ছাত্রজীবনেও। ১৯১৪ সালে যখন দামোদরের প্রবল বন্যা হয়, মেঘনাদ তখন এম. এস-সির ছাত্র। তিনি আত্রত্রাণের জন্যে কৃষ্ণকুমার মিত্রের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন, ডক্টর মেঘনাদ তখন ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক সাহায্যদানের জন্যে তিনি ইস্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘ গঠন করেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তিনি অতি দীন ও নগণ্য অবস্থা থেকে নিজের কর্মের ও মনীষার দ্বারা আজ এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছেছেন। গবেষণাগারের নিভৃতে ব'সে তিনি সাধনা করেছেন ও করছেন বটে, কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ ও দুর্দশার সম্বন্ধে তিনি এতটুকু উদাসীন নন্।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জ্বলন্ত সূর্য থেকে সামান্য একটি নগণ্য খণ্ড একদিন বিক্ষিপ্ত হয়ে পাক খেতে শুরু করে এবং ক্রমশ শীতল হতে হতে এই

পৃথিবী গড়ে উঠেছে। মেঘনাদও তেমনি একটি অগ্নিগোলকের মত তাঁর অসামান্য প্রতিভার তীব্র তেজ নিয়ে ছাত্রজীবন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কর্মজীবনে। তার পর নানাভাবে পাক খেতে খেতে অভিজ্ঞতার বাতাসে শীতল হয়ে আজ এই মনীষীর রূপে দেখা দিয়েছেন। আজ তিনি তাই কেবল বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, সর্বত্র বন্দনীয়।

আইনস্টাইন, লর্ড রাদারফোর্ড, অধ্যাপক রাসেল ইত্যাদি বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা মেঘনাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রীত ও উল্লসিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছেন। তখন মেঘনাদ বয়সে অতি তরুণ এবং পরাধীন ভারতের একজন নাগরিক। সেকালের সেই ভারতে বাস ক'রেও বিদেশীর দৃষ্টি যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এটা কেবল তাঁর নয়, সমগ্র ভারতের এবং ভারতবাসীরই সৌভাগ্য।

১৯১৭ থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন; ১৯২৬ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি এ রকমের প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তার পর তিনি যেসব প্রবন্ধাদি লেখেন, তার সংখ্যাও সামান্য নয়। এ ছাড়া আছে অন্যান্য সতীর্থ ও সহকর্মীদের সহযোগে লিখিত নিবন্ধাদি। সে এক সুদীর্ঘ তালিকা।

তাঁর রচনাদি বেশির ভাগই বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পত্রে ও পত্রিকায় ছড়ানো আছে, তাঁর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্ররা সেইসব রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। এ-উদ্যোগ শুভ উদ্যোগ।

একটা পিন্ পড়লে শব্দ পাওয়া যায়, এমনি নিঃশব্দ ঘর। মাঝেমাঝে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠছে। মাঝেমাঝে শব্দহীন পদপাতে দু-একজন ছাত্র আসছেন, দু-একটি কথা সেরে চলে যাচ্ছেন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স— একটি কেন্দ্রীয় শাঁসকে ঘিরে রয়েছে অণুর গুচ্ছ; এখানেও তেমনি এই অধ্যাপককে ঘিরে আছে একটি ছাত্রগোষ্ঠী। এর মধ্যে আমি বেখাপ আমি অন্য জগতের অধিবাসী। তাই কথা সাঙ্গ করে উঠে পড়লাম।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে। নির্জন রাস্তা অতিক্রম করে সদর সড়কে এসে পড়লাম, সার্কুলার রোডে। চমকে উঠলাম মটোরের হর্নে। সামনে তাকিয়েই দেখি, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে গেল একটা স্বদে মোটর-গাড়ি। ঘণ্টি বেজে উঠল ট্রামের। হঠাৎ এক নীরবতার রাজ্য থেকে এসে পড়লাম কোলাহলের জগতে।. .

রচিত গ্রন্থাবলী

The Principle of Relativity

Treatise on Heat

Treatise on Modern Physics

Junior Text Book of Heat with Meteorology

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নাম পৃথিবীময় ছড়ানো বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স-খ্যাত সেই বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের মেজাজটা একেবারে বাঙালী মেজাজ। বৈঠক পেলে যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ছোটকে ছোট ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র জ্ঞান নেই— এক বৈঠকে ব'সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। সে-কথায় বিজ্ঞানের জটিলতা নেই, জ্ঞানের গরিমা নেই। সে-কথা অকপট বৈঠকী কথা। যেন বৈঠকের সকলেই তাঁর সমান জ্ঞানী, কিংবা তিনি যেন বৈঠকের আর-পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন।

এইভাবেই কথা বলেছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ। দুধ-সাদা চুল মাথায়, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, গায়ে জালি গেঞ্জি। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে কথা বলছেন। মাঝেমাঝে দু-একজন গবেষক-ছাত্র মোটা বই খুলে এসে পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বইয়ে উঁকি দিয়ে তাঁদের কথার জবাব দিয়ে দিচ্ছেন ওরই মধ্যে।

বললেন, "জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাও? আমার জীবন অতি সাধারণ জীবন। কিছুই নেই এ জীবনে। পাঁচজনে জেনে খুশি হবার মত কোনোই উপকরণ নেই।"

বললাম, "তবু। আপনার বাল্যকালের কথা।"

হেসে উঠলেন, বললেন, "বুঝেছি। তুমি চাও কবিতা।"

কবিতা চাই নি। কিন্তু জীবন কি সত্যিই কবিতা নয়? জীবনের যত ছন্দ, সে তো জীবনেরই ছন্দ; জীবনের যত সাধনা সে তো কবিতা-আরাধনাই। কাটাকুটি-করা কাব্যের পাতা থেকে যেমন প্রকৃত কবিতাটিকে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সন্তর্পণে তুলে নিতে হয়, জীবনের অনেক আঁকিবুঁকি-কাটা পাতা থেকেও তো তেমনি আসল জীবনটা আলাদা করেই নিতে হয়। ঝরঝরে ছাপা কাব্য পাঠ করতে হয়তো আরাম লাগে, কিন্তু কবির হাতের কাটাকুটি-করা পাতাটা দেখায় একটি বাড়তি খুশি আছে। সেই পাতাটা দেখার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

বললেন, "এখন যেখানে হরিণঘাটা আমার দেশ তারই লাগোয়া গ্রামে ছিল, কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি। কলকাতাতেও গোয়াবাগানে আমাদের বাড়ি ছিল একটা ; আমার মামার বাড়িও ছিল কলকাতায়। এখন মামার সে বাড়ি নেই— তার উপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ চলে গিয়েছে। আমি বাল্যকাল থেকে কলকাতারই বাসিন্দে, আমাকে তাই বলতে পার",— হেসে বললেন, "ক্যালকেশিয়ান।"

যখন বাল্যকালে কলকাতায় তাঁর জীবন কেটেছে, তখন কলকাতার চেহারা ছিল আলাদা। এত বড় বড় রাস্তাও ছিল না. রাস্তা এমন পীচ-ঢালাও ছিল না। তখন রাস্তার গায়ে গায়ে ছিল নর্দমা। কলকাতায় চলত ঘোড়ায় টানা ট্রাম।

গ্রামে দারুণ ম্যালেরিয়া, তার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় থাকতে হল। কিন্তু নিজেদের গোয়াবাগানের বাড়িতে নয়— একটা ভাড়াবাড়িতে।

তাঁর ঠাকুরদা সরকারী চাকরী করতেন. চারদিকে সফর করে বেড়াতে হত তাঁকে। একবার এমনি সফরে গিয়ে হঠাৎ তিনি মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথের পিতার উপর সব দায়িত্ব পড়ল।

বললেন. "বেশ অসুবিধাতেই পড়া গিয়েছিল। তার উপর কলকাতায় নিজেদের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ভাড়াবাড়িতে থাকতে হল ; কেননা, আমাদের বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন আগে থেকেই। বাড়িভাড়া পাওয়া

যেত মাসে হয়তো পাঁচ টাকা। এইভাবে টানাটানির মধ্যে জীবন আরম্ভ করা গেল।"

ছাত্রজীবনও আরম্ভ হল সেইসঙ্গে। তাঁর বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। প্রথমে অন্য দু-একটি স্কুলে কয়েক বছর পড়ে অবশেষে হিন্দু স্কুলে এসে ভর্তি হলেন অষ্টম মান শ্রেণীতে। ১৯০৮ সালে এনট্রান্স দেবার কথা ছিল; কিন্তু বয়স কম থাকায় পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে, এনট্রান্স পাশ করেন। এ সময় হয়তো তাঁর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বললেন, "এনট্রান্সে আমি হই ফিফথ। জামতাড়া স্কুলের দুটি ছাত্র ফার্স্ট ও থার্ড হয়েছিল। এদের সঙ্গে পরে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়—এদের একজন থাকত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, তার বাড়িতে খুব যেতাম।"

হিন্দু স্কুল থেকে পাশ করে তিনি ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বললেন, "ওটা ছিল যেন একটা নিয়ম। হিন্দু স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সিতেই ভর্তি হতে হয়—এই রকমেই আমরা জানতাম।"

একটু থেমে হেসে বললেন, "প্রেসিডেন্সিতে এসে বিপদে পড়ে গেলাম। তখন ওখানে তিন জন সাহেব-প্রফেসার। এঁদের কোন্‌টি যে কে, রোজ গোলমাল হয়ে যেত। সব সাহেবের মুখ আমাদের চোখে একই রকম ঠেকত।"

এই গোলমাল আর বিপদ ডিঙিয়ে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে দীপ্তি দেখা দিতে শুরু করল বলা যায়। এই দীপ্তি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স-সহ তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করলেন। বি. এ. পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সিতেই মিশ্রগণিতে এম. এ. পাঠ শুরু করেন। তার পর ১৯১৫ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন।

১৯৫৩ সালের ২রা মে, ১৩৬০ সালের ১৯শে বৈশাখ—শনিবার বেলা দুপুর। সায়েন্স কলেজের সুপ্রশস্ত ঘরে বসে তাঁর কথা শুনছি। বৃহৎ টেবিলের চারধারে বসে আছেন কয়েকজন প্রবীণ শ্রোতা। তাঁদের মধ্যের একজন সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যাপক-জীবনের ছাত্র—মাত্র এক বছর নাকি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তিনি পড়েছেন ১৯২০ সালে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এই কথা নিয়ে একটু পরিহাস করলেন।

বললেন, "এম. এ. পাশ করার পর ভাবছি কি করা যায়। একটা কাজকর্ম সংগ্রহ করা দরকার। তখন সায়েন্স কলেজের এই বিল্ডিং সবে উঠেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর কেমিস্ট্রির ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে তখন এখানে আছেন। এতে সকলের ধারণা হয় যে, সমস্ত বিল্ডিংটাই বুঝি কেমিস্ট্রির জন্যে হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে এসে অনেকটা হানাই দিলাম। কিছু দিন আগে সার্ আশুতোষ আমাদের ডেকেছিলেন। তাঁকে বললাম, 'এখানে ফিজিক্সের ডিপার্টমেণ্টও তো খোলা যায়।' তিনি বললেন, 'কে পড়াবে? তোরা পারবি?' বললাম, 'পারব।' আশুতোষ বললেন, 'তার আগে তা হলে তোদের এক বছর পড়ে নিতে হবে।' এই বলে তিনি একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করলেন। আমরা এসে ঢুকলাম এখানে। কী উৎসাহ তখন। এইসব ঘর নিজে হাতেই মাপজোক করে ফিজিক্সের ডিপার্টমেণ্ট তৈরি করেছি।"

নিজে হাতে গড়া সেই ডিপার্টমেণ্টের এখন তিনি প্রধান— হেড অব দি অব ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। প্রথমজীবনে এসে যেখানে গড়েছিলেন তাঁর তপস্যার কেন্দ্র, জীবনের শেষের দিকে এসে পুনরায় তাকেই করেছেন সাধনকেন্দ্র। যে জিনিস 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে' সেই জিনিস প্রত্যহ তিনি দান করে করে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলছেন তাঁর ভাণ্ডার।

১৯২১ সাল পর্যন্ত এইখানে ছিলেন। তার পর যান ঢাকায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। ষাট লাখ টাকা ঢেলে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক টাকা, তাই মোটা টাকার গ্রেডে নেওয়া হচ্ছে অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানের রীডার-পদ নিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকায় গেলেন। ওদিকে দালান তুলতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল; তখন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাঁদের পুরনো স্কিম তাঁরা সংশোধন করবেন। গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অধ্যাপক এতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন যে, যাঁদের নতুন নেওয়া হবে তাঁদের নতুন স্কিম অনুযায়ী দেওয়া হোক, পুরাতনেরা পুরাতন গ্রেডেই থাক্। কিন্তু তা নাকি সম্ভব নয়। চারদিক বজায় রেখে সত্যেন্দ্রনাথকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হল। বলা হল, সংশোধিত গ্রেড তিনি গ্রহণ করুন, কর্তৃপক্ষ নিজেরা খরচ করে তাঁকে ইউরোপ পাঠাবেন। শুভ প্রস্তাব। সত্যেন্দ্রনাথ রাজি হলেন। এদিকে, কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ার। খরচপত্র করে যাঁকে তাঁরা বিদেশে পাঠাচ্ছেন, বলা যায় না, তাঁর 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ-দেহ আকাশ হতে'—তাহলে তো খেদের অন্ত থাকবে না, সব খরচপত্র ভস্মে ঘি ঢালারই অনুরূপ হবে; তাই তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনবীমা করালেন, প্রিমিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষই দেবেন এবং অঘটন কিছু ঘটলে টাকাটাও পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়। এই হল রফা। জীবনবীমা করার সময় তাঁর প্রকৃত বয়স জানা দরকার হল। তাঁর পিতা জানালেন তাঁর জ[illegible] সালে, ১৩০১ বঙ্গাব্দ। তাঁর বিদেশযাত্রার দিন আগতপ্রায়। এমন সময় জার্মানী থেকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের কাছ থেকে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটা চিঠি পেলেন। তখন ১৯২৪ সাল।

বললেন, "এতে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল। সেই চিঠি আমি কর্তৃপক্ষকে দেখালাম। এতে আমার বিদেশযাত্রার সম্ভাবনাটা আরও

থাকা হল। আমার একটা পেপার জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে সেখানকার একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইন সেই পেপারটি পড়ে খুশি হন। এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ওই চিঠি দেন।"

১৯২৪ সাল। তিনি বিদেশে গেলেন। প্রথমে গিয়ে নামলেন ফ্রান্সে— প্যারিসে। এখানে সিলভাঁ লেভির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। লেভি তখনও শান্তিনিকেতনে আসেন নি, কিন্তু ফরাসী প্রবাসী অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তখন তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহন বসু, এঁদের অন্যতম। এই পরিচয়ের সূত্রেই সত্যেন্দ্রনাথেরও লেভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়।

বললেন, "যেসব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমার খুব আগ্রহ হল। সিলভাঁ লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে দেখা করলাম মাদাম কুরীর সঙ্গে। কুরী তখন বৃদ্ধা। বৃদ্ধরা স্বভাবতঃই কথা একটু বেশি বলেন। কুরী আমাকে পেয়েই অনর্গলভাবে কথা বলতে লাগলেন। বললেন, আমি যদি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছা করে থাকি তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে ফরাসী ভাষা শিখে নিতে হবে, কেননা, তা না হলে তাঁর কথা আমি বুঝতে পারব না— এতে কাজের ভীষণ অসুবিধে হবে। তিনি এমনভাবে একটানা বলে যেতে লাগলেন যে, তার মাঝে একটু ফাঁক পেলাম না যে বলি, ফরাসী ভাষা আমি জানি।"

ফরাসী ভাষা তখন সত্যেন্দ্রনাথের ভালোভাবেই জানা ছিল। যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন ইউনিভার্সিটির কাছে ফরাসী ভাষা শেখার একটা ক্লাস হত, এখানে তিনি নিয়মিত যেতেন। তার পরেও এ-ভাষা চর্চা করেছেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এক ফরাসী-দম্পতি থাকতেন, তাঁরাও ফরাসী শেখাতেন, সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের কাছেও ফরাসী শিখেছেন। এইভাবে ভাষাটা তাঁর রপ্ত হয়ে যায়।

বললেন, "তার উপর আমি তো সবুজপত্রের দলের একজন ছিলাম। যদিও লিখি নি কখনো। সেই সূত্রে প্রথম চৌধুরীর লাইব্রেরিতে বসে বিস্তর ফরাসী বই পড়েছি। কিন্তু, দেখ, মাদাম কুরীকে এই কথাটা জানাবারই সুযোগ পেলাম না।"

ফ্রান্স থেকে তিনি যান জার্মানীতে। সেখানে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় খুব। তাঁর দৌলতে, সত্যেন্দ্রনাথ যেন সগর্বে জানালেন, জার্মানীতে অনেক-কিছু দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। যেসব জায়গায় সাধারণের এবং বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ, এমন অনেক সরকারী দপ্তরের ভিতরে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন সব।

বললেন, "আর পেয়েছি বই। আইনস্টাইনের লেখা একটা চিঠি নিয়ে ওখানকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে যখন খুশি এবং যে বই খুশি নিয়ে আসতে পেরেছি। তিনি সে দেশের একজন অধ্যাপক মাত্র, কিন্তু তাঁর একটা চিঠিকেই সে দেশের গবর্নমেণ্ট কতটা মর্যাদা দিত— দেখে খুব ভালো লাগত।"

একটু থেমে কৌটো থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন, "আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে কিছু দিন আগে আমি একটা বই চেয়েছিলাম। তাঁরা জানালেন যে, এটা রেয়ার বই, ইশু করার নিয়ম নেই। আর জানো তো, আমাদের এই ন্যাশনাল লাইব্রেরির গবর্নিং বডির আমি একজন মেম্বার।"

তাঁর এ কথায় কোনো আক্ষেপ বা অনুযোগের সুর ছিল না। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মনের মধ্যেই আক্ষেপ আর অনুযোগ গুঞ্জন করে উঠল। যে আসনে একদা আসীন ছিলেন আচার্য হরিনাথ দে, যাঁর মত বহুভাষাবিৎ সুপণ্ডিত পাওয়া দুষ্কর, যিনি নিজেই ছিলেন একটা গ্রন্থাগারের

অনুরূপ, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁকে বলেছেন—'সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা', এখন সে আসনে বসবার উপযুক্ত লোক বুঝি আর নেই। আমাদের জীবনের মান সব ক্ষেত্রেই কতটা নেমে গিয়েছে, তাই মনে হল।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক নন। কয়েকটি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাঁর মধ্যে প্রবল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যৌবনকাল থেকে, এই অনুরাগের জন্যেই সবুজপত্রের গোষ্ঠীর মধ্যেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। ল্যাবরেটরির সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই তিনি নিজেকে সর্বদা আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন চারদিকে নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়িয়েছে। বলেছি, তাঁর মেজাজ বৈঠকী মেজাজ। তাস ও পাশায় তাই তাঁর আকর্ষণ খুব বেশি। দর্শন সাহিত্য সুকুমারশিল্প ও সংগীতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। এককালে তাঁর সেতার বাজাবার অভ্যাস ছিল।

পদার্থবিজ্ঞানে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগই অধ্যাপক বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস ব'লে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে পরিচিত সেই বসু-স্ট্যাটিসটিকসই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় দান। ১৯২৪ সালে প্ল্যাঙ্কস ল অ্যাণ্ড কি লাইট কোয়াণ্টাম হাইপথেসিস নামে তাঁর যে পেপারটি প্রকাশিত হয়, এবং আইনস্টাইনের দৃষ্টি সর্বপ্রথম পড়ে যার উপর, সেই পেপারটিই তাঁকে কেবল ভারতবর্ষে নয় ইউরোপেও প্রখ্যাত করে তোলে এবং তিনি পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অন্যতম বলে পরিগণিত হন। এই সময় যখন তিনি ইউরোপে যান তখন বহু গণ্যমান্য বিজ্ঞানী তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা আরও বিস্মিত হন, যখন তাঁরা দেখেন যে এমন-একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের যিনি রচয়িতা তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সের একজন যুবক।

তাপ পেলে সব জিনিসেরই আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এই আন্তরিকতার উত্তাপে এবং অভিনন্দনের তাপে তাঁর আয়তন বাড়ল না, তিনি সমান বিনয়ী সমান নম্র সমান নির্বিকার এবং সমান বৈঠকীই রয়ে গেলেন।

তাপের দ্বারা আয়তন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা বিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট দান। একটা লোহার পাত উত্তপ্ত করলে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সেটা বেড়ে যায়। কিন্তু তার এই বৃদ্ধিটা ঘটে কি করে? তাপে কি তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ফেঁপে ওঠে?—ছোলা জলে ভেজালে সেগুলি যেমন মোটা হয়, সেই রকম? তা নয়। অণুরা সরে যায় তফাতে তফাতে। সব অণু নাকি সমান সমান দূরে সরে দাঁড়ায় না; এর মধ্যেও নাকি ভেদ আছে। অণুরা সরে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা গতির বৃদ্ধি সঞ্চার হয়, এইজন্যে একে বলা হয় থারমোডাইনামিক্স। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা এই থারমোডাইনামিক্সের প্রসারের পথে অনেক সহায়তা করেছে। আইন-স্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের পেপার অনুবাদ করেছেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন গবেষণার পূর্বে এই পদ্ধতিটি ম্যাক্স-ওয়েল-বল্‌জ্‌ম্যান স্ট্যাটিসটিকস নামে পরিচিত ছিল—এই বিজ্ঞানীদ্বয় পদার্থের অণুকে একেবারে পৃথক পৃথক ভাবে ধরতেন, যেন তাপ পেলে অণুগুলি আলাদা আলাদা ভাবে তাদের উত্তপ্ত আচরণ আরম্ভ করে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নূতন পদ্ধতিতে অণুর এই স্বাতন্ত্র্যটি অস্বীকার ক'রে দেখালেন যে, এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবারে স্বতন্ত্র ও একক ভাবে নয়; অণুরও ক্ষুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন—তিনি তার উপর তাঁর এ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন বলা যায়।

এর পর বিজ্ঞানীদ্বয় ফেরমি ও ডিরাক অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত এই সূত্র ধরে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা তাপের প্রভাব নিয়ে

গবেষণা না করে করলেন আলোর প্রভাব নিয়ে। অধ্যাপক বসুর সূত্রটি তাঁরা আলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখলেন যে, সব ক্ষেত্রে সমান ফল ফলছে না। কোনো-একটি পদার্থ থেকে আলো যখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তখন কি জলের মত আলোর ধারা তৈরি হয়ে তা আমাদের চোখে এসে ধাক্কা দেয়, না, কতকগুলি অণুতে নূতন কম্পন শুরু হওয়ায় আলোর উৎপত্তি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অণুতে-অণুতে নূতন কম্পন জাগে, সেই কম্পন হয়ে ওঠে আলো; ফের্মি ও ডিরাক এই অণু নিয়ে কাজ করলেন। তাঁরা দেখলেন, অধ্যাপক বসুর পদ্ধতি জোড়-সংখ্যক বস্তুসংখ্যায় (oven mass number) ঠিক ঠিক খাটছে, বিজোড় সংখ্যায় নয়। যে যে ক্ষুদে অণুতে অধ্যাপক বসুর সূত্রটি খাটছে, বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁর নবরচিত গ্রন্থে অধ্যাপক বসুর নাম অনুযায়ী সেই সেই ক্ষুদে অণুর নাম দিয়েছেন— বোসোন।

বিদেশে সফর শেষ করে তিনি ফিরে আসেন ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রীডারের পদ থেকে ক্রমশ পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান হন— হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স। সেইখানেই ছিলেন অনেকদিন। তার পর ১৯৪৫ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। এখন কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজই তাঁর কর্মকেন্দ্র।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন; ১৯৪৮-৫০ সালে ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইউনেস্কোর একটি জরুরী কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য প্যারিসে যান। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসারের জন্য গঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি বর্তমানে সভাপতি। বাংলার জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে

'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় মাঝেমাঝে তিনিও প্রবন্ধাদি লেখেন; বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরল ভাবে ব্যক্ত করাই তাঁর রচনার বিশেষত্ব।

সাধারণত তাঁর রচনার মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না। তাঁর গবেষণামূলক পেপারেও এই বিশেষত্ব দেখা যায়। তাঁর এইসব রচনার দ্বারা কেবল যে ছাত্ররাই উপকৃত হন এমন নয়; যাঁরা স্কলাররূপে খ্যাত হয়েছেন তাঁরাও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন এবং গবেষক-ছাত্ররা পেয়েছেন পথনির্দেশ।

সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও বঙ্গভাষার যুগপৎ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।

সত্যেন্দ্রনাথের বয়স এখন উনষাট। এখনো তিনি কঠোর শ্রম করে থাকেন। সমস্তটা দিন তিনি অতিবাহিত করেন বিজ্ঞান-কলেজে। পদার্থ-বিদ্যারই তিনি অধ্যাপক, কিন্তু গণিত ও রসায়নের গবেষক-ছাত্ররাও সারাদিন তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও সহায়তা লাভ করে থাকে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন অমায়িকতা এবং হৃদ্যতা আছে যে, ছাত্রদের কাছে তিনি প্রিয় অধ্যাপকরূপে গণ্য হতে পেরেছেন।

বর্তমানে তিনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

বসু ও আইনস্টাইন নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে, আধুনিক ফিজিক্সের যে-কোনো পাঠ্যপুস্তকে বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্‌এর উল্লেখ আছে। এইজন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে বলা হয়ে থাকে বাংলার আইনস্টাইন।

বললেন, "বাল্যজীবনের কথা তো বললাম। আমার আর-একটা পরিচয় আছে— আমি আইনস্টাইনের ছাত্র।"

শ্রদ্ধা যে করতে না জানে সে কারো শ্রদ্ধা পায় না। নিজের অধ্যাপকের প্রতি তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা আছে, এইজন্যেই তিনিও সম্ভবতঃ তাঁর ছাত্রদের এবং আমাদের মত সাধারণের কাছে এতটা শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন।

দশ-বারো জন ছাত্র এসে ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে। তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন। তাদের সঙ্গে চললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা, লম্বা বারান্দা পার হয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি, সিঁড়ির গায়ে ছাত্রপরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বলছিলাম না, আমার জীবনে কোনোই বিশেষ উপকরণ নেই। এখন দেখ, এ দিয়ে যদি তোমার কোনো কাজ হয়।"

তিনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। আমি নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে নীচে। বড় গেট পার হয়ে বড় রাস্তায়। বৈশাখের রোদ লেগে পীচের রাস্তা গলে গেছে। মন গলাতে রোদ দরকার হয় না, দরকার হয় অকপট আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতার এলাকা থেকে এসে দাঁড়ালাম উত্তপ্ত রৌদ্রে।

রচিত গ্রন্থাবলী

Warmegleichgewicht im Stralungsfeld nei Anwesenheit von Materie. (Heat-Equilibrium in Radiation field in presence of Matter)

Zeitschrift fur Physik, 27, 384, 1924.

Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese. (Planck's Law & the Light quantum Hypothesis).

Zeitschrift fur Physik 26, 178, 1924.

Les identites de divergence dans la nouvelle theorie unitaire.

Comptes rendus des seances de l' Academie des Sciences. t. 236 p. 1333 seance du 30 mars, 1953

The Affine connection in Einstein's New Unitary Field theory.

Annals of Mathematics.

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনকথা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। ১৯শে মে ১৯৫৩) কয়েকদিন পরেই তিনি ইউরোপ গমন করেন। ইতিমধ্যে তিনি নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সক্ষম হন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় এখানে তার থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি'র (আপেক্ষিক তত্ত্ব) কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণসমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যায় যে, অধ্যাপক বসুর ঐ আবিষ্কার আপেক্ষিক তত্ত্বের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

বুডাপেস্টের বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক বসু বুডাপেস্টের পথে জেনেভা যাত্রা করেন। ইউরোপে তিনি কোপেনহেগেনের পদার্থবিজ্ঞান ইনসটিটিউটের অধ্যাপক এন. বোহার এবং জুরিখে অধ্যাপক ডবলিউ. পাউলির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও পরিদর্শন করিবেন।

আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপক বসু যে গবেষণা চালাইতেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহার সহিত অধ্যাপক আইনস্টাইন এবং ডাবলিনের

অধ্যাপক ই. স্রডিঞ্জারের সহিত পত্রালাপ চলিতেছে বলিয়া জানা যায়। অধ্যাপক বসু এতৎসম্পর্কে যেসকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিদেশের বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাসমূহে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার একটি প্রবন্ধ ইতিমধ্যে ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক স্রডিঞ্জারের মতে আপেক্ষিক তত্ত্বে এমন কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণ আছে, যাহার পূর্ণসমাধান করা প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক বসু তাঁহার নিরলস গবেষণার দ্বারা ঐসকল সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন। উল্লিখিত ফরাসী পত্রিকা ব্যতীত আমেরিকা এবং ইটালীর পত্রিকাসমূহে ঐসকল প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জেনেভা হইতে অধ্যাপক বসু প্যারিস যাত্রা করিবেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিবেন। তিনি প্যারিস হইতে জুরিখ এবং তথা হইতে প্রাগ যাইবেন। প্রাগ হইতে তিনি বুডাপেস্টে শান্তি-সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাত্রা করিবেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার তাঁহাকে তথায় এক মাস অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। অধ্যাপক বসু রাশিয়াতেও যাইতে পারেন।

ইউরোপে অবস্থানকালে অধ্যাপক বসু বিভিন্ন ল্যাবোরেটরি পরিদর্শন করিয়া তথায় বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত কর্মীদের শিক্ষার পদ্ধতি ও তাঁহাদের কি প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তাহা দেখিবেন।

ইউরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর অধ্যাপক বসু আমেরিকায় অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া জানা যায়।

প্রকাশ-তারিখ

আনন্দবাজার পত্রিকায় জীবনকথাগুলি প্রকাশের তারিখ—

শ্রীযদুনাথ সরকার	১৮ কার্তিক	১৩৫৯।	৪ নবেম্বর	১৯৫২
শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	১৯ জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০।	২ জুন	১৯৫৩
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়	১০ চৈত্র	১৩৫৯।	২৪ মার্চ	১৯৫৩
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	৮ বৈশাখ	১৩৬০।	২১ এপ্রিল	১৯৫৩
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	২৪ চৈত্র	১৩৫৯।	৭ এপ্রিল	১৯৫৩
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার	২৬ ফাল্গুন	১৩৫৯।	১০ মার্চ	১৯৫৩
শ্রীনীলরতন ধর	২২ বৈশাখ	১৩৬০।	৫ মে	১৯৫৩
শ্রীমেঘনাদ সাহা	১২ ফাল্গুন	১৩৫৯।	২৪ ফেব্রুয়ারি	১৯৫৩
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	৫ জ্যৈষ্ঠ	১৩৬০।	১৯ মে	১৯৫৩

মনীষী-জীবনকথা সম্বন্ধে

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন—

"জীবিত মানুষের জীবনী লিখিয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে নূতন দিক আবিষ্কার করিলেন।"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—

"এই বই বাংলা সাহিত্যের দরবারে এমন-একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, যেখানে এটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকবে। স্বদেশ ও সাহিত্য, এই দুএরই এমন যুগপৎ সেবার নিদর্শন বিরল। আপনার দৃষ্টি ও সৃষ্টি, দুএরই বিশিষ্টতায় আনন্দিত হয়েছি। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বাংলা সাহিত্যের বহু বই যখন লুপ্ত হয়ে যাবে, আপনিও যখন থাকবেন না, তখনও এই বইএর মূল্যবত্তা থাকবে; শুধু তাই নয়, বাড়বে। এককথায় এই বইএর মূলনীতি হচ্ছে— বঙ্গ-দর্শন। এই বই বাঙালিকে শেখাবে নিজের প্রতি দৃষ্টি দিতে, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে। আমাদের প্রতি এই বইএর বাণী হচ্ছে— 'আত্মানং বিদ্ধি', যার চেয়ে মহত্তর বাণী আর কিছুই হতে পারে না।

প্রথম খণ্ডে আছে

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
বসন্তরঞ্জন রায়
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য
শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী

তৃতীয় খণ্ডে আছে

শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী
শ্রীসুনয়নী দেবী
শ্রীসরলাবালা সরকার
শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
শ্রীসুশীলকুমার দে
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়